



জৈষ্ঠ, ২৬
June, 10

উন্মেষ

মনের উন্মুক্ততা বেঁচে থাকুক চিন্তনে মননে

গল্প, দদ্য, চিত্র মেলা,
রয়েছে কিছু মজার খেলা,
আবোন-তাবোন থাকবে কিছু
যেমনটাই ছিল সন্দেশ।

যুক্তি তর্কের যাই ওপরে,
কল্পনাকে সঙ্গী ক'রে
রঙ-বেরঙের খেলায় মাতুক
আমাদের এই উন্মেষ।



SCAN ME

UNMESH

A Manifestation of Creativity



An effort by
the students of

The Department of Physics

School of Mathematical Sciences

**Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research
Institute**

(Declared by Govt. of India as Deemed University under section 3 of UGC Act, 1956)

Belur Math, Howrah



June, 2025

Seventh Edition

Unmesh 2025



Unmesh

Published by,

Department of Physics

Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute

(Declared by Govt. of India as Deemed University under section 3 of UGC Act, 1956)

P.O: Belur Math, Dist: Howrah, PIN: 711202, West Bengal, India.

Phone: (033) 2654-9999

e-mail: phy.rkmvu@gmail.com, rkmveri@gmail.com

Website: <http://physics.rkmvu.ac.in/>

First Edition: September 2016,

Second Edition: April 2017,

Third Edition: September 2017,

Fourth Edition: November 2021,

Fifth Edition: November 2022,

Sixth Edition: January 2024,

Seventh Edition: June 2025.



About the Magazine:

Breaking away from the familiar rhythm of classes, lab work, projects, and assignments, the students of the Department of Physics proudly present the seventh edition of Unmesh. This magazine is a celebration of their journey — weaving through cherished memories, confronting challenges, and chasing dreams. Over time, Unmesh has become more than just a publication; it stands as a platform where creativity meets curiosity, where imagination blends with intellect. Here, students express themselves through poems, stories, articles, paintings, and photographs each creation reflecting their passions, hopes, and inspirations. Driven entirely by the students from planning and designing to editing and finalizing with wholehearted support from the Department and the University, Unmesh remains a magazine of the students, by the students, and for the students.

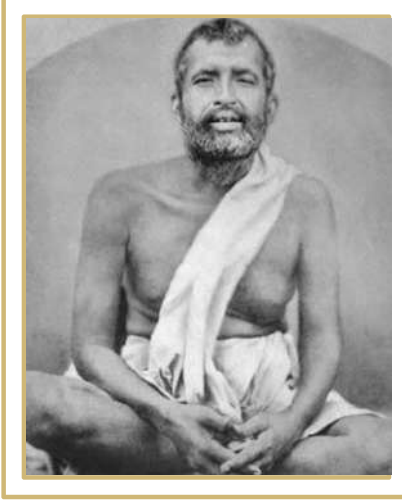
In this seventh chapter, we once again invite you to witness the unfolding of dreams and the spirit of minds that dare to imagine and create.

Unmesh 2025

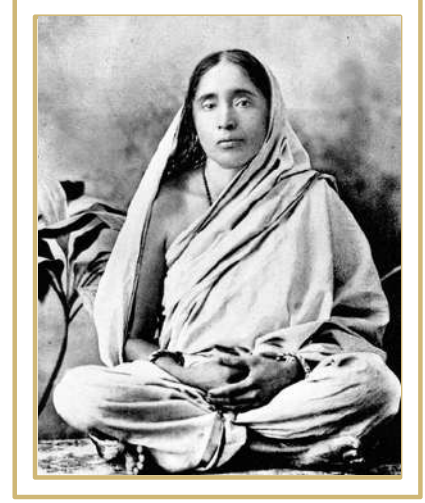




“যদি সত্যি মন থেকে কিছু
বসন্তে চাণ্ডি তাহলে পথ পাবে,
আর যদি না চাণ্ডি
তাহলে অজুহাতি পাবে।”



“যতি মতি ততি পথ”
- শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব



“যদি শান্তি চাণ্ডি, কণার দোষ
দেখোনা, দোষ দেখাবে নিজের।”
- শ্রীশ্রী মা সারাদা দেবী

সম্পাদবর্গ

ছেলেবেলার মাঠখানি আজ শূন্য...

ফিরিয়ে দাও সেই দিনগুলো, যেখানে বিকেল মানেই ছিল দৌড়ঝাঁপ, কাদামাটির গন্ধ, আর গাছতলায় গল্প। আজ মাঠ আছে, খেলা নেই—ক্রিকেট-ফুটবলের জায়গা দখল করেছে মোবাইল ফোন। এখন আর চোখে চোখ রেখে গল্প হয় না, আঙুলের চাপেই চলে জীবনের রঙ। ছোট থেকে বড়, সকলেই বন্দি এক হাতে ধরা পর্দার আলোয়।

চিন্তার রাজ্যে ঢুকে পড়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা—যা ভাবার আগেই ভেবে দেয়, জানার আগেই জানিয়ে দেয়। এমন এক প্রবল পরিবর্তনের হাওয়ায় যেন কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ছোটবেলার স্বপ্নেরা, কল্পনার বিস্তার, মুক্ত ভাবনার ডানাগুলো। আর তাই তো, কোথায় যেন ভেঙে যাচ্ছে আমাদের মনন-সংস্কৃতি, নড়ে যাচ্ছে সম্পর্কের ভিত।

এই প্রযুক্তির ভিড়ে, আমরা যেন আরও নিঃসঙ্গ—নিজের সাথেই সময় কাটানোর অবকাশ যেন হারিয়ে ফেলেছি। তাই তো, সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে, আমরা আবার খুঁজছি নিজেদের—কে আমি, কেন আমি, কেমন আমি? এই অনুসন্ধান, এই উপলব্ধিই আমাদের পত্রিকা ‘উন্মেষ’-এর জন্মদাত্রী।

একটু দেরিতে হলেও, প্রায় এক বছর পরে, আবারও ফিরে এলাম—নতুন ভাবনা, নতুন রূপে। এই যাত্রায় আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও সহপাঠীদের ভালোবাসা, উৎসাহ আর সমর্থন আমাদের পাথেয়। বিশেষ করে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় প্রধান Bobby Ezhuthachan, যাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া উন্মেষ এই পথে এগোতে পারত না; এবং আমাদের সহপাঠী মেঘনা মাইতি ও সহকারী সম্পাদক—সুস্মিতা বিশ্বাস, সৌম্যদীপ দে যাঁদের নিঃস্বার্থ শ্রম আর সৃজনশীলতা আজকের এই রূপ দিয়েছে আমাদের পত্রিকাকে।

আমরা আশা করি, ‘উন্মেষ’ পাঠকের হৃদয়ে নতুন আনন্দের উন্মেষ ঘটাবে।

“The spiritual impact that has come to Belur [Math] will last fifteen hundred years, and it will be a great University. Do not think I imagine it; I see it.” -Swami Vivekananda

আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূরক হিসাবে যে বিজ্ঞান, ধর্ম এবং আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রয়োজন, স্বামীজির এই উপলব্ধির বাস্তব রূপায়ণই হল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute। আশা করি, আমরা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হব।

“জীবনের পরম সত্য এই: শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; দুর্বলতাই মৃত্যু।” (১৯৫৩)
- স্বামীজি



Unmesh 2025





“आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च”
Atmano mokshartham jagat hitaya cha

-Swami Vivekananda

***“Only a life lived for others is a life
worthwhile.”***

-Albert Einstein



Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute

(Declared by Govt. of India as Deemed University under section 3 of UGC Act, 1956)

Belur Math, Howrah

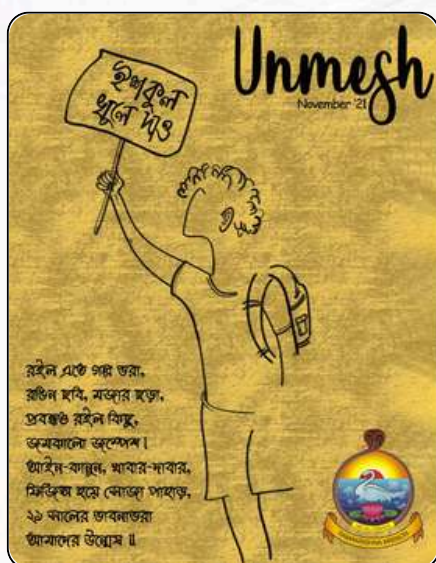
(Accredited by NAAC with A++ Grade)

The Department of Physics

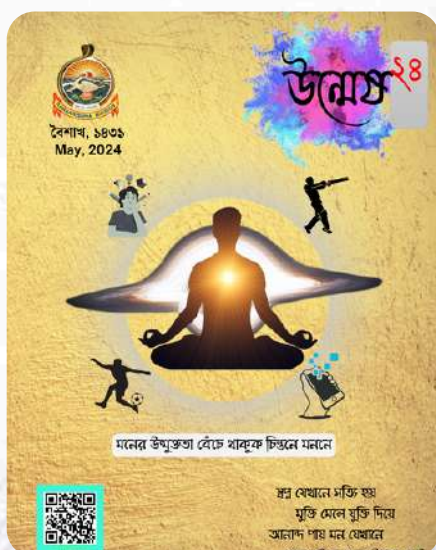
Unmesh 2025



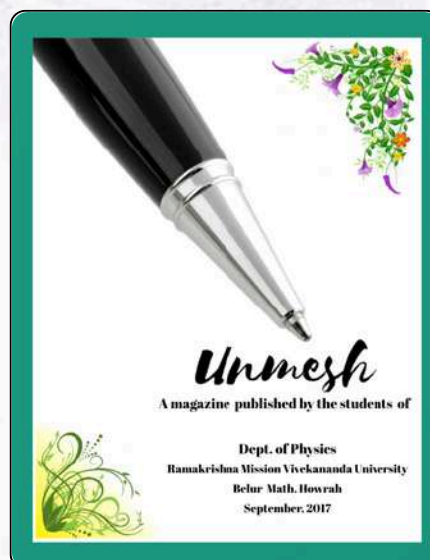
Previous Editions



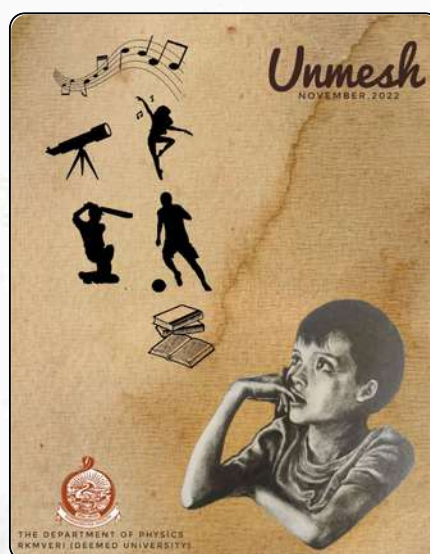
Unmesh 4th Edition
2021



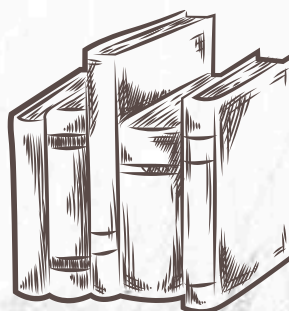
Unmesh 6th Edition
2024



Unmesh 3rd Edition
2017



Unmesh 5th Edition
2022



Available at <https://physics.rkmvu.ac.in/unmesh-students-magazine/>

Unmesh 2025

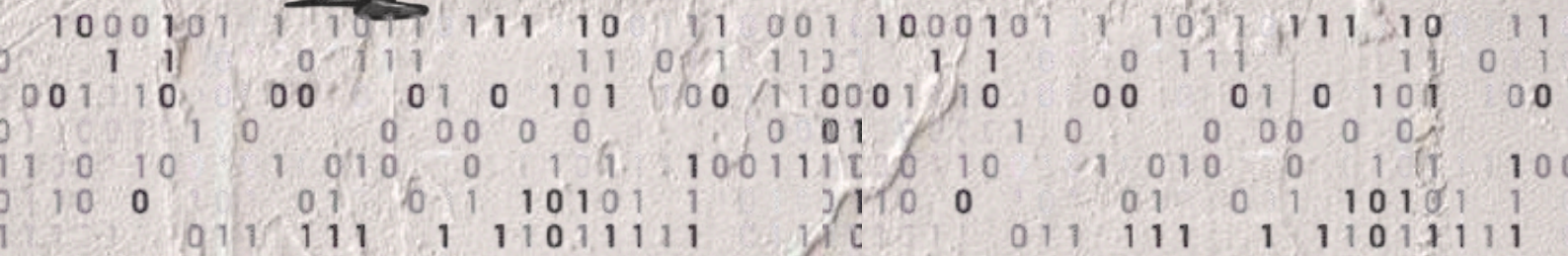
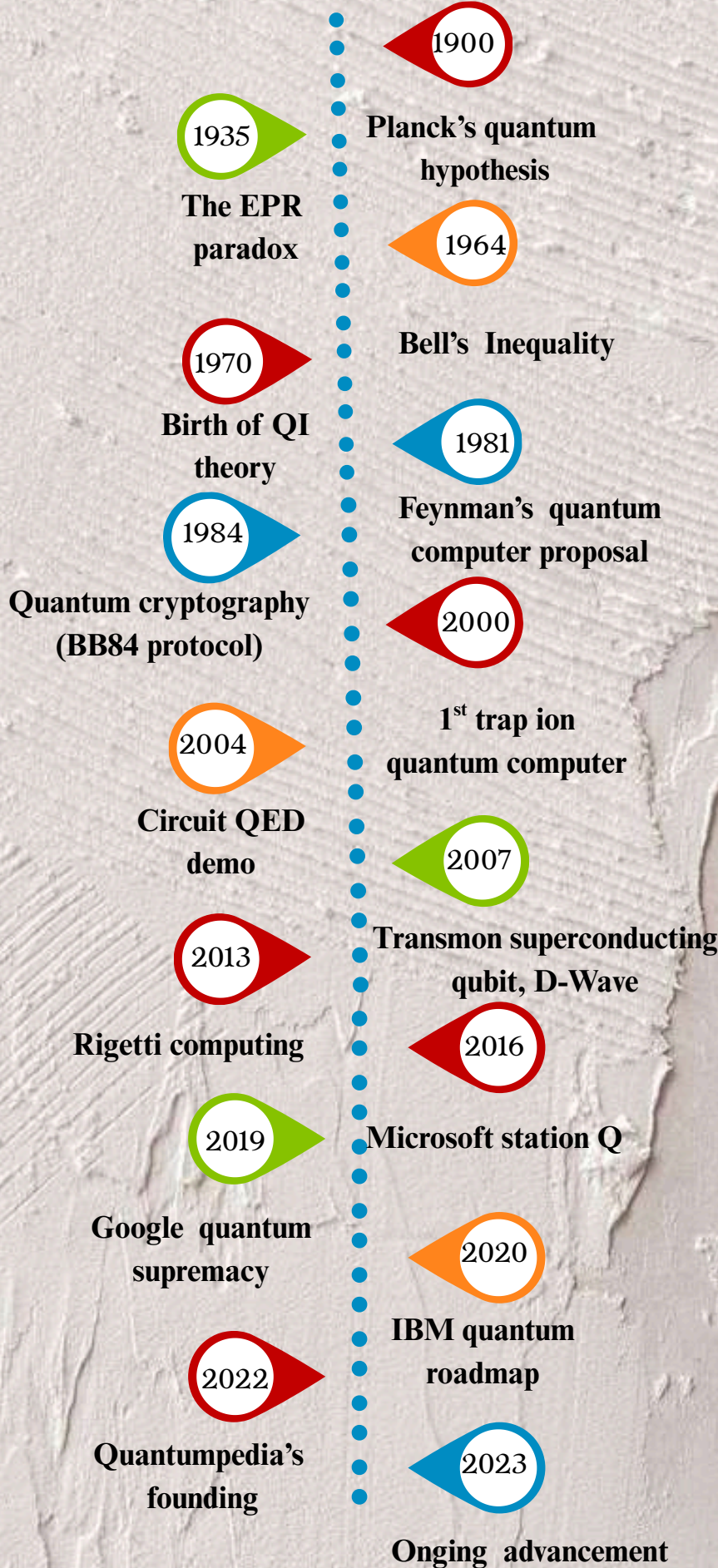
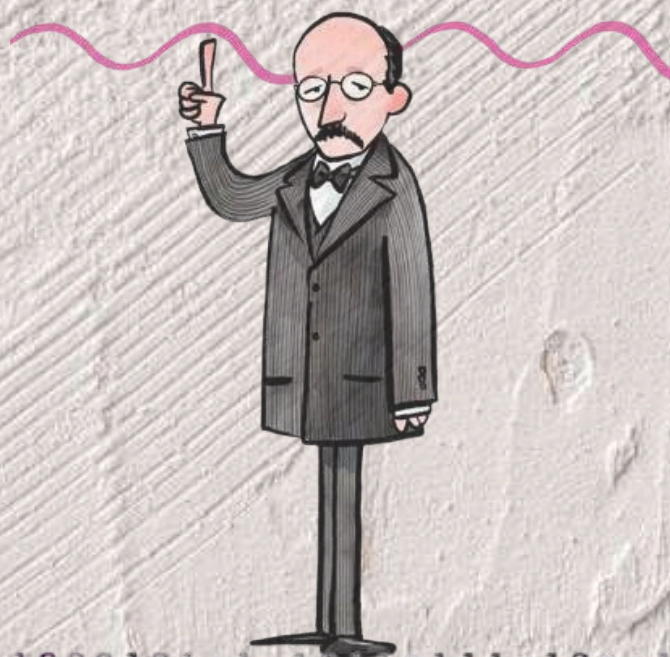
100

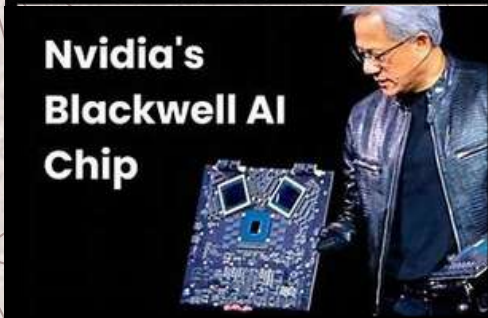
YEARS OF

QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY

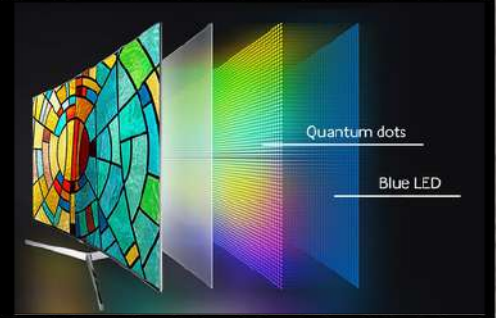
(1925 - 2025)

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \text{cat sitting} \right\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \text{cat lying} \right\rangle$$





**Nvidia's
Blackwell AI
Chip**



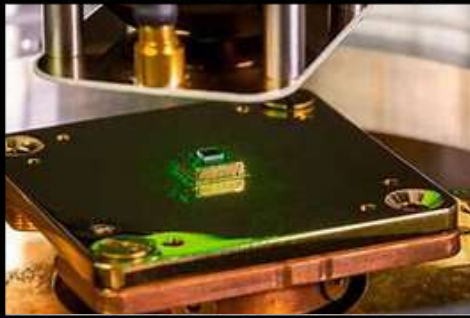
Personal AI supercomputer

Quantum computational chip - SYCAMORE

Quantum dot TV screen



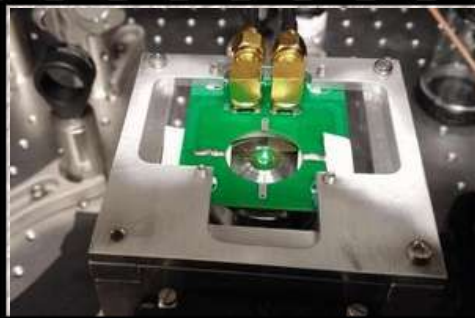
Majorana -1 to create stable qubits



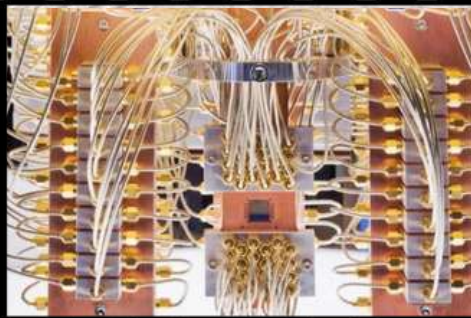
Quantum Bio- Sensor



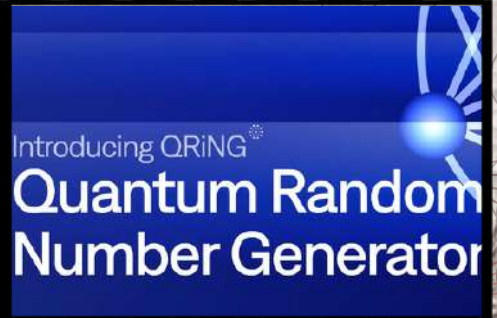
Quantum medicine dor targeted drug delivery



Quantum Diamond Sensor brain imaging



NVIDIA qcQuantum for drug discovery



QRING for cybersecurity

Quantum
Computers



Quantum
Superposition



Quantum
Jumps



This is where it
starts to get
interesting...

Dude.



Editorial board

In e- journal editing

2nd Year students of Physics Department

In gratitude and encouragement

Dr. Bobby Ezhuthachan and the respected faculty
members of the Dept. of physics .

Editors



Meghna Maity

meghnamaity989@gmail.com



Sushmita Biswas

biswapremjit23@gmail.com



Soumodip Dey

soumodipmedey@gmail.com

সূচীপত্র

কাব্যভাসমূহ

1. আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়	1	সুপ্রিয়া পাল
2. বল কী!	2	রক্তমাখা
3. অপ্রত্যাশিত প্রার্থনা	3	অরিত্র বসাক
4. আত্মপরিচয়	3	-----
5. আদিম খেলা	4	-----
6. Merry Christmas	4	-----
7. মাংসপিপাসু	5	-----
8. প্রসঙ্গ : সাম্প্রতিক	6	প্রত্যয় রায়
9. বাউল	6	-----
10. মুক্তার সন্ধানে	7	সায়ন দত্ত
11. খ্যাল	8	-----
12. আনমনা	9	অঙ্কুর হালদার
13. ধূসর	9	-----
14. Before I Die	10	-----
15. ঘুমালাম	11	-----
16. নাম নেই যে কবিতার	11	-----
17. স্মৃতি	12	হিজিবিজ্‌বিজ্
18. ঠিকানা	13	-----
19. উদ্দেশ্যহীন	14-15	-----
20. প্রতীক্ষা	16	সৌম্যদীপ সরকার
21. The Alchemy	17-18	Atreyee Biswas

গল্পগুচ্ছ

1. The ship that sailed within	19	Aritra Basak
2. A birthday worth celebrating	20	-----
3. Where numbers lose their name : The edge of discontinuity	20	-----
1. কাকতালীয়	21	শুভম ঘোষ
2. সিকিমে হাড় হিম	22-23	-----
3. Dead poets society	24-25	Sayan Dutta
4. অমানুষ	26	অঙ্কুর হালদার
5. ফেসবুক	27	-----
6. ধুলো আবিষ্কার	28	-----
7. কোন নগর	29	-----
8. পৃথিবী বড় অদ্ভুত	30	-----
9. Tracing domestic life through popular Japanese Anime	31-36	Mariom Mamtaj
	--	-----

নাটক



Content in canvas

Drawing & Crafts

1. Junita Jaiswal	45
2. Meghna Maity	46
3. Sneha Bhunia	47
4. Srijit Seal	48-50
5. Sudip Sarkar	50
6. Rupam Nandy	51-52
7. Sohini Mitra	53
8. Deboleena Podder	54
9. Supriya Pal	55
10. Sayan Dutta	56-58
11. Supriya Pal	59
12. Aritra Basak	60
13. Srijit Seal	61-62

Photography

1. Arka Bhattacharyya	63-65
2. Akash Sharma	66-67
3. Aritra Basak	68-69
4. Atasi Bhattacharyya	70-71
5. Meghna Maity	72-74
6. Ritwik Das	75-76
7. Rupam Nandy	77-78
8. Saptarshi Bhaduri	79-80
9. Sayan Dutta	81-82
10. Sneha Bhunia	83
11. Somnath Roy	84-85
12. Soumodip Dey	86-87
13. Soumyadip Sarkar	88
14. Sudip Sarkar	89
15. Supriya Pal	90
16. Sushmita Biswas	91
17. Mariom Mamtaj	92

The Event Horizon

1. Crossword	93-94
2. Sudoku	95

Snapshots = Vibes x Time





কবিতাসমুদ্র

(Poetry)

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়



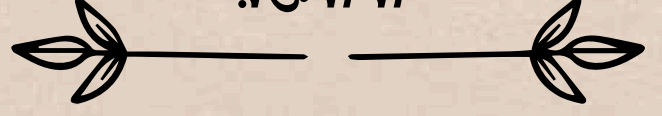
সুপ্রিয়া পাল

(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২৩-২৫)

আপন মহিমায় মহিমাম্বিত আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়,
এ যে স্বরঃ ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আলয়।
হেথা নানা ভাষা নানা প্রাপ্ত মিলে একাকার,
অন্তরে আছে মিল মোলার হোক না যতই প্রকাশ।
মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিবারাত্রি,
মনে কত না কৌতূহল! আর প্রাণে এক অজানা স্মৃতি।
মিলেছি আমরা এই স্থলে আছে এমন সৌভাগ্য কজনার?
আমরা যে সব ছাত্র-ছাত্রী স্বরঃ মা সারদা-রা।
থাকবে তুমি হৃদয় জুড়ে যায় না আমরা যতই দূরে
তোমার দেওয়া শিক্ষা নিয়ে বিষয় গীতি গাইবো সুরে
তুলবো জীবন বিষয়কেতন, বাণী তোমার করব মনন।
না যেন পেরোয় মোরা তোমার বরণ,
আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদের প্রাণের বিশ্ববিদ্যালয়।



রক্তমাখা



আমার লেখার পাঠক কে?

— পাগল আদমি যে, সে।

এমন কথা বলছে কেন তুমি?

— কাকা সাহিত্যের মান নষ্ট করছে তুমি।

আমি এতই কি বাজে লিখি?

— নিজেই পড়ে দ্যাখ দেখি।

কেন হে! আমি তো দেখেছি পড়ে।

— হ্যাঁ, পড়েছে আনাড়ির মতন করে।

আচ্ছা, তুমি কি বন্ধু নও আমার?

— কেন, তাতে কী সন্দেহ তোমার?

ভাবছি, এত সদুপদেশ কি শত্রুতেও দিত আমায়?

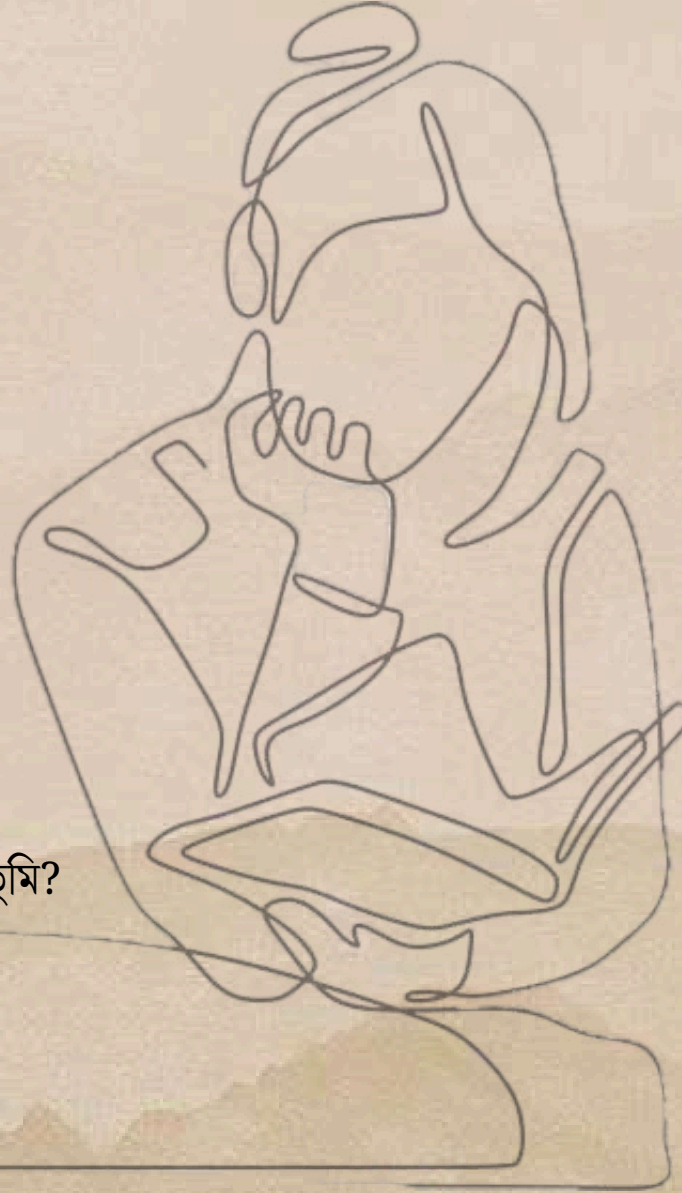
— হ্যাঁ, আমি বন্ধু বলেই তো দিচ্ছি তোমায়।

হ্যাঁ, আজ আমাকে বড়ো অনুপ্রেরণা দিয়েছ তুমি।

— ও আচ্ছা, আজ থেকে তবে আরও বেশি করে লিখবে তুমি?

বাহ! — তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান।

— হ্যাঁ, তোমার কাছেই সব শেখা — ‘শ্রীমান’।



অপ্রত্যাশিত প্রার্থনা



অরিত্র বসাক

(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২৩-২৫)

বেদনা যেন মোর চিরকাল রহে,
চিরকাল গলে কণ্টক হার,
ক্ষণে ক্ষণে যেন বাজে হৃদয়ে,
অপূর্ণতার দীপ্ত সার।

শিক্ষা সেথায় যেখানে আছে
মৃত্যুমুখী ঘোর পতন,
ঠুকে ঠুকে যেন হয় সাজা সেই
মেরুদণ্ডের প্রাণ রোপণ।

ভাসে যেন এই আঁখির পরে
বয়ে আনে সব দুঃখ-বিষাদ,
ভাসে যেন মনে সকল রোদন
রাতের নীরব আর্তনাদ।

অপমানগুলো ফুটে ওঠে যেন
মোর বাগানের ফুল হয়ে,
চেয়েছি যাহারে তার প্রস্থান
যায় যেন হৃদকুল ধুয়ে।

নিবারণ করা ক্ষুধাগুলো যেন
বাজতে থাকে এ উদরের আজ,
বিকৃত এই জীবনে যেন,
রহে না নকল সুখের আঁচ।

আত্মপরিচয়

আমি, আমার হারিয়ে দিয়ে,
বিষাদ মণে, অতল বন, গভীর বাসনা নিয়ে,
পদতলে মোর, শিকল টুটিয়ে, মহাকাশ পথ দিয়ে,
যা ছিল অশ্ব, সকল ছুটিয়ে, প্রবল বেগেতে ঢেকে,
আমি চলেছি সে পথ দিয়ে।

আমার আমি বলে কিছু নাই,
কেবল তাহারই আলোকছটাতে, চিরকাল বয়ে যায়,
ঐ যে গগনে, বইছে পবন, জলধারাতেও ধাই,
মুক্ত জীবন, হৃদয় গোপন, বারে বারে ধরা খাই,
আমি কেবলই লুটিয়ে যাই।

আমার নাহি আছে কোনো প্রাণ,
জড়ার উদরে, জড়াই জড়ায়, থেকে থেকে হয় স্নান,
অগ্নিশিখার তপ্ত আঁচে, শুদ্ধ কেবল তাহাই বাঁচে—
বাকি সব অবসান,
একধারে সব, অস্থি জমলা, ওপরে দীপ্তিমান,
আমার থেমেছে সকল গান।

আদিম খেলা

যত্নে বেঁধে, অটল সেধে
তৈরি হাতের পুতুল নিয়ে
যাব যেদিন তোমার কুলের ধারে,
রক্ত মেখে, শূন্য থেকে
পড়বো আমি নিঃস্ব হয়ে
তোমার আঁখির অন্ত কুল-কিনারে।

মৃত্যু ফাঁসি, ওষ্ঠে হাসি
যাব যখন দেখতে তোমায়,
আমার জোয়ারে রাস টেনে তুমি ধরো,
পুতুল বানিয়ে, যত্নে সাজিয়ে,
সামনে তোমার নিয়ে গিয়ে বলি,
এইবার তারে ছারখার করে ফেলো।



Merry Christmas

Neither was I the son of lord,
Nor was I the thorn,
Nor am I the fading star
For I was never born!

Neither do I have a place to dwell,
Nor do I have an ego to swell,
Neither am I the do-er or the deed,
For I'm free from cosmic duel.

I'm you, in the subtlest thread,
I'm the One—and there's no us,
I'm the truth, that's worth bowing to,
I'm in you, and you're Jesus!





কেন জানি আজ বাহির সদরে
ভাসে মন চায় দেহের আদরে
আকাশ পাতালে ধায়,
কেন জানি আজ মায়ার চাদরে
দিই স্থান যারে প্রেমের জোয়ারে,
কেন জানি মন মাংসপিপু
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খায়!

মস্তক মাঝে দখল করে,
চিন্তায় তার রাত্রি জুড়ে,
যেমন হৃদয়ে একাকিত্ব
খেলে মোর সাথে মালিক ভূ ত্য,
কামবাসনায় যেমনি আমারে
ছুটিয়া ছুটিয়া ধায়।





প্রশ্নঃ স্মার্তিক

প্রত্যয় রায়

(প্রথম বর্ষ, ২০২৪-২৬)

বাউল

পূব আকাশে বিষাদ মেঘের ছায়া
এ মহা আঁধারে তীব্র মশাল জ্বালো!
ছাই থেকে আজ ফিনিক্স হয়ে জ্বালো,
নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখবে চলো!

নতুন হাওয়া ডাক দিয়েছে বলে
রাজার নামেও জেহাদ চলে গেছে!
আমরা আবার নতুন স্বপ্ন বুকে
গল্প লিখব নিজস্ব আন্দাজে!

হয়ত ভয়ের প্রহর হয়নি শেষ,
দীর্ঘ পথের বাজি ধরো সেনিক!
ক্লান্তি, ভয়ের শিকল তুচ্ছ করে—
বন্ধু, হও আজ তবে পদাতিক!

পূব আকাশে রাঙা মেঘের ছোঁয়া
নতুন ভোরের আশায় বাঁচে চাষা...
সার্থক হোক মানব জনম আজ,
সার্থক হোক মানুষের ভালোবাসা!

তোমার একতারাখান তুলে ধরো আজ
বাজাও সুরে...

লাল পাহাড়ের দেশের ছন্দে,
নাচের ঘোরে..
কত পীড়িতে ফুল ফোটে আজ
হাসছে মাটি, গাইছে আকাশ
হাওয়ার তালে হারিয়ে যাওয়ার
বাউল মনের আজ অবকাশ...

কত নতুন ফুল ফোটে রোজ
পথের ধারে, পথের গানে,
কত নতুন আবেগধারা
বইছে যে রোজ সঙ্গপনে!
কত নতুন কাব্য, কবি
লিখছে ওই একলা বসে
বাজাও তোমার একতারাটা
সবার হয়ে বাউল রসে!

মুক্তার সন্ধানে



সায়ন দত্ত

(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২৩-২৫)

আমি সেদিন বেরিয়েছিলাম মুক্তার সন্ধানে।
গভীর সমুদ্র তোলপাড় ক'রে
ঝিনুক খুঁজলে পাওয়া যায় যে মুক্তা।
শুনেছিলাম সে নাকি বড্ড কঠিন কাজ।
ভয় কি হয়েছিল? জানি না.....
তবু আমি বেরিয়েছিলাম মুক্তারই সন্ধানে।

পথে মিলেছিল অনেক সাথী।
স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল তারা।
শিখেছিলাম জানতে, ভালবাসতে,
আবার হারতেও শিখেছিলাম। কিন্তু...
শুধু শিখিনি হেরে গিয়ে ফিরে যেতে।
আমি যে কিনা বেড়িয়েছিলাম মুক্তার সন্ধানে।

যে মুক্তা নিয়ে যায় মুক্তির পথে,
জানার পথে, আত্মার সেই মোক্ষলাভের পথে।
জানা নেই সে অমরত্বের সন্ধান দেয় কিনা।
কিন্তু জীবনের সন্ধান দেয় ঠিকই,
দেয় আমরণ শান্তির সন্ধান।

ওই যে, তারা দেখি ফিরে আসছে,
গিয়েছিল যারা ঝিনুক খুঁজতে।
হাতে তাদের কি ওগুলো? শ্যাওলাধরা,
কালচে ধূসর, ওগুলোই কি তবে ঝিনুক।
ওরা বলে ওঠে, "না গো, এগুলো তো শামুক।"

আমি বললাম, "কিন্তু তোমরা যে বেরিয়েছিলে
মুক্তার সন্ধান।" "মুক্তা? সে তো বড্ড কঠিন কাজ।
তাকে পেতে যেতে হয় সমুদ্রের অতল গভীরে।
বরং তুমিও কিছু আনতে পারো শামুক কুড়িয়ে।
ওই যে দূরে দেখা যায় সমুদ্রতট।"

এবার আমার ভয় হলো, মনে এলো সংশয়।
আমি যে মুক্তাকে খুঁজতে চেয়েছিলাম।
অনুভব করতে চেয়েছিলাম তাকে
আমার পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে।
এবার আমার সত্যিই ভয় হলো।

বসে আছি তীরে একা।
সমুদ্রের ঢেউগুলো আন্দোলন তুলছে মস্তিষ্কে,
অনবরত নাড়া দিচ্ছে হৃদয়ের বাসাগুলিকে।
যাতে বাস করে কতগুলি স্বপ্ন, আরো কত দুঃস্বপ্ন।
এখন শুধু সেই ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের জাগরণের অপেক্ষায়।
মুক্তার সন্ধানে তারই চায় মুক্তি, শুধু তারই চায় মুক্তি।

खयाल

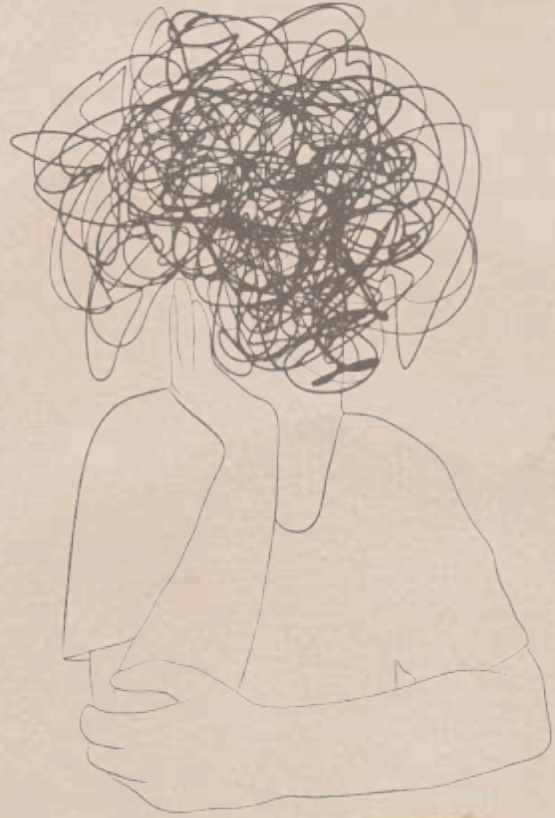
हकीकत मुझे पता नहीं था,
हम तो ख्वाबों में खोया रहे।
दुनियादारी मुझे मालूम नहीं,
सितारों में हम घूमते रहे।

किसी दिन अचानक तूफ़ान आया,
दुख और दर्द भी संग लाया।
अब उलझा हुआ हूँ इन्हीं हिसाबों में,
कि कितने नुकसान भर ना पाया।

अब कितना दिन सहना पड़ेगा,
ज़िंदगी के इस वज़न को।
काफ़ी कुछ खो गए हैं मेरे,
इतनी सी चीज़ पाने को।

फिर एक दिन अचानक बारिश आई,
इतना बोझ दिल ने सह नहीं पाया।
आसमान साफ़ होने के बाद,
उम्मीद का सूरज निकल आया।

इसे ही तो कहते हैं ज़िंदगी जनाब,
कभी ऊपर, कभी नीचे।
जब तक जान है इस दिल में,
कभी भी ना मुड़ना पीछे।





আনমনা

বৃষ্টিভেজা কোনো কার্নিশে
অন্ধকারে কারা চুল শুকায়
তোমার জন্য মানি হার মিছে
এভাবে থেকে বসে অপেক্ষায় ।।

স্পর্শকাতর এক বকুলবাস
ছিন্ন করে মোর সব খেলা
তোমার ঠোঁট আর দীর্ঘশ্বাস
স্বপ্নে দেখি আমি দুইবেলা ।।

যেভাবে কেটে যায় নিঝুম রাত
আমায় কুরে খায় নিরাগ ভোর
সূর্য হার মেনে যায় হঠাৎ
তোমার গন্ধে ফেরে আমার জোর ।।



অক্ষর হালদার
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২৩-২৫)

ধূসর

পৃথিবীটা নীলচে গুহার মতো
কুয়াশায় মাখা কালবৈশাখীর মতো ।
ফাঁকা মাঠে কালো মেঘের তলায়
ঝড়ের হাওয়ায়
একা দাঁড়িয়ে থাকার মতো ।
ধানক্ষেত, আর একটা চড়ুই ।
"ওর বাড়ি কোথায় ?

হাওয়ায় ওকে ওদিকে কেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ?
ও তো বাড়ি ফিরতে পারবেনা !"
কিছু শিশুর কোমল স্বরের প্রশ্ন ।
নিভে যাওয়া মোমবাতি জ্বালানোর চেষ্টায় থাকা বৃদ্ধ
ফেলে দীর্ঘশ্বাস, "ওই বা হাওয়ার দিকে
ওড়ার চেষ্টা করছে কেন ?"
শিশুরা বলে ওঠে, "ওর হয়তো বাড়ি ঐদিকে"
মোমবাতি জ্বলে ওঠে,
বৃদ্ধ জানলা বন্ধ করে মুড়ি মাখতে চলে যায় ।।

Before I Die

Before I die, I want to tell my parents
that I'm grateful.

I'm grateful that you two created me
from the mixture of your DNAs.
I'm grateful that you nourished me and my intellect.
I'm grateful that you helped me become
a multicellular, complex, conscious, sentient being
from a single membrane-less cell.

Before I die, I want to tell my children
that we are just an infinitely small part
of this gigantic cosmos.

All these politics, religions, countries are meaningless.
Even our existence doesn't affect the dynamics of the universe.
You will face so much chaos in your lives.
Just remember—all of it is anomalous,
just a tiny part of this "pale blue dot."

Before I die, I want to tell my wife
that I'm happy.

I'm happy I spent my life with you.
Don't be sad—I will never truly be gone.
All the atoms in my body will remain with you
in this same universe.
You will breathe the same air molecules that I breathed.
I will be here, but at equilibrium.
Thermodynamics will not allow me
to reach a greater entropy than equilibrium itself.
I'll be a little disorganized, as I've always been.

Before I die, I want to tell myself
that I lived a wonderful life—
a life of ups, downs, charms, and beauty,
so strange but true, just like the quarks.
I lived a life I could never have dreamed of.

I thank you, Mother Nature.
I thank you.

ঘুমালাম

আরো একটা গভীর রাত মিশে গেল
আরো একটা অন্ধকার খাদের তলায়।
কিছু নিশাচর প্রেমিক এখনো আছে জেগে।
একাকীত্ব, অভিমান একসাথে হয়ে
চলে গেল বহুদূর চড়ে শহুরেপনায়।
তাও তারা আড়ালেতে নিঃশব্দে ঠোকরাতে শেখে।
কখনো জানিয়েছিল কেউ
আসবেনা ফিরে আর কখনো
জানায়নি শুধু যাওয়ার সময়।
চন্দ্রবিভীষিকা যেন
হাসনুহানার ডালে বসে,
মেনে নেয় তার সমস্ত পরাজয়।
আমি তার মাঝে কেন
বহু খুঁজে পাইনা !
কেন পাইনা খুঁজে কোনো জ্যোৎস্নার ঢেউ,
যার ঘাড়ে চেপে সব যন্ত্রনা নিংড়ে
বলবো এ রাত্রিতে, "ঘুমালাম!"
যেমনটা বলেছিল, কখনো কেউ !

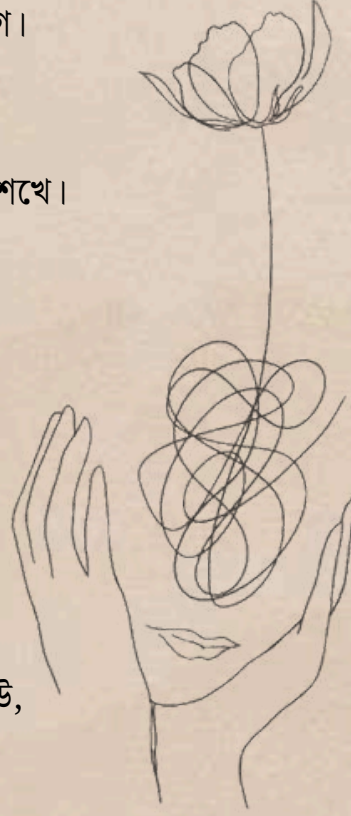
নাম নেই যে কবিতার

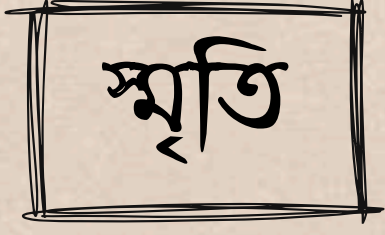
তোমাকে পেতেই হাঁটা
কঠোর পায়ে অনেক যোজন
তোমাকে ছুঁতেই চেয়ে
মায়ার জালে এ সম্মোহন।

তোমার ঐ কাজল চোখে
ডুব দিয়েছি উঠবোনা আর
তোমার ঐ নীলচে ঠোঁটে
আমার গোটা জীবন কাবার।

তোমাকে খুঁজতে গিয়ে
হারাই অনেক সবুজ বাতি
তোমার ঐ কোমল হৃদয়
আমার একার শীতলপাটি।

তোমার ঐ স্নিগ্ধ শরীর
অন্ধ গলির হলুদ আলো
তোমাকেই আমার করে
খাচ্ছি খাবি বাসছি ভালো।





হিজিবিজবিজ

প্রতিসন্ধ্যায় আচমকা জেগে উঠে,
অর্ধনিদ্রা পূর্ণ পলকে —
ছুটে পালায় কাঁচা-পাকা রাস্তা ধরে,
এই প্রতিযোগিতার যুগে,
প্রতিষ্ঠিত হতে।

এই আধুনিক সভ্যতার যুগে,
নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করে —
দিনান্তে আসি, বাসায় ফিরে,
সন্তুষ্ট বোধ করে, অথচ
একটা অজানা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ক্লান্তি নিয়ে!

কোনোদিন পরিশ্রম করে,
যদি বাড়ি আসি ফিরে,
কোনো মন্দ দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে
আত্মউপলব্ধির অবকাশ পাই আমি
এবং ভাবি বিহ্বল মনে,
কোথায় ছিলাম আমি
আর এখন কোন অভিমুখে চলন্তগামী!

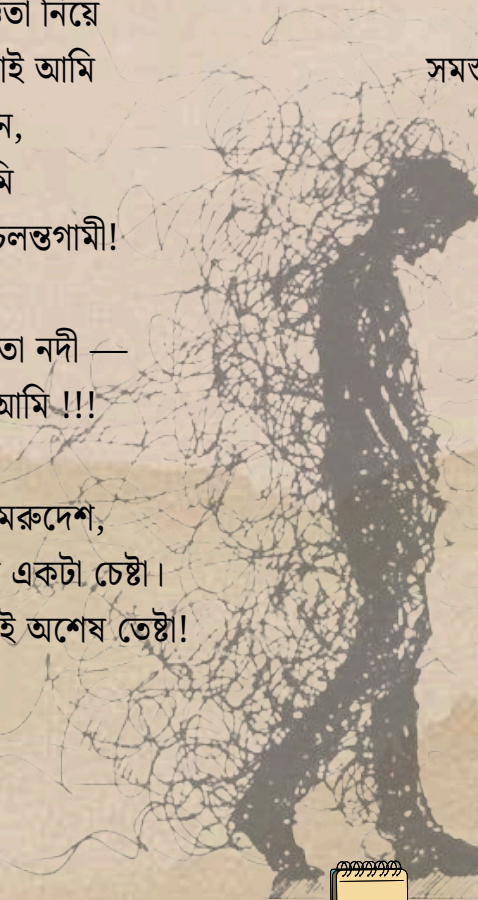
কখন যদি হয়ে থাকি খরশ্রোতা নদী —
তবে কি এখন বদ্ধ পুকুর আমি !!!
এই পরিচিত —
অথচ, অপরিচিত মানুষের মরুদেশ,
নিজের মরুদ্যানকে খুঁজে পাবার একটা চেষ্টা।
কিন্তু মরীচিকার ভ্রমে মিটে কি সেই অশেষ তেষ্টা!



অবিশ্রান্ত দিনগুলি আমার,
নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা।
যন্ত্রচালিত সভ্যতার মাঝে,
মন্ত্রের মতো অবিক্রিতভাবে গাঁথা।

এমন অপরিবর্তনীয় দিনগুলি
অবিরামভাবে অতিবাহিত হতে হতে —
কালচক্রে, হঠাৎ, কোনো অচল দিনে —
কদাচিৎ তখনই কোনো শ্রাবণের ক্ষণে
ঘরের বিদ্যুৎ যায় চলে,
ফোনের ব্যাটারি যায় ফুরিয়ে,
মানুষের হাতের

সমস্ত আধুনিক যন্ত্রগুলি; যখন হয়ে যায় অকেজো —
চারিদিকে যখন নিঝুম সঁগাত সঁগাতে ভাব,
টাপুর টুপুর করে হয় বৃষ্টি,
এবং হয় পরিবেশে এক ছায়াছবির সৃষ্টি,
তখনই সেই বৃষ্টিভেজা সন্কেবেলা —
বসেছি। পাশে রয়েছে খোলা জানালা।
স্মরণে আসে আমার ছোটবেলা,
যখন ঘরে রয়েছি একলা।
ছলছল হয়ে উঠে আঁখি,
পূর্বের স্মৃতিতে ভাসতে থাকি।।



সেই বয়সটাই ছিল এমন,
মনে সাধ হত যেমন তেমন।
পূরণ করবার জন্য হতাম ব্যাকুল,
না হলে হয়ে উঠতাম আকুল।

ভাবি, এ কি হয়েছে আমার —
না মানুষ,
না জানোয়ার,
যেন কলে রূপান্তর হয়েছে আমার!

হ্যাঁ, আজ হয়েছি বড়ো,
কিন্তু কেজানে কেন
আমার জগৎটা —
হয়ে উঠেছে বেশ জড়ো সড়ো!
ধরা-বাঁধা একটা অধীন জীবন নিয়ে,
নিয়মিত কিছু কাজের মধ্যে দিয়ে,
অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছের মতো —
ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে চলাফেরা করছি আজ!



ঠিকানা

ঠিকানা চাও তুমি,
কিন্তু সে তো জানো তুমি।
মনে পড়ছে না তোমার,
অথচ, তোমারই অজান্তে তোমার জানা।
খুঁজে পাবে আমাকে সেই জায়গায়
যেখানে যাবে তোমার দৃষ্টি।
তোমার দৃষ্টির গণ্ডি পেরিয়ে,
তোমার ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুভূতিহীন হয়ে,
কোনোদিন দূরে চলে যাবো না আমি।
সর্বদা পাবে তুমি আমায়
সময়ে-অসময়ে সবসময়।
ওই-যে দূরে যে পাহাড় দেখছো,
তার গায়ে যে বিশাল সবুজ অবয়ব
তার কণায়-কণায় আছি আমি।
তোমার মাথার উপর যে আকাশ,
আর বয়ে চলা সুন্দর বাতাস,
আর তার উপর সাদা-কালো যে মেঘরাশি,
তাতেও আমি আছি।
কিংবা ভাবো, রাতে যখন পুরো আকাশ —
ছিটিয়ে করছে অসংখ্য বিন্দু।
অথচ তুমি তাকিয়ে আছো শুধু সেই একদিকে
যেই দিকে রয়েছে সেই জ্যোৎস্নার উৎস,

তখনো আমি রয়েছি তোমারি পানে চেয়ে,
সেই অনন্ত গগন বেয়ে।

ওই যে দেখছে দূরে সেই দিগন্ত,
মিলিয়ে গিয়েছে যেখানে সব,
তার রেখায় রেখায় আমি আছি।
সুদূরের নয় তোমারই কাছাকাছি।

লক্ষ করেছে? তোমার সামনে যে নদী বয়ে যায়
আর মোহনার কাছে মিশে যায় সমুদ্রে,
তেমনই তোমার সামনে দিয়ে বয়ে চলেছি আমি
আর প্রতিনিয়ত মিলে যাচ্ছি সেই অনন্তে।
দেখতে পাচ্ছো চারিপাশে যে উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলো,
তাদের যদি একবার সাধ্যমত দাড় করিয়ে তুলো,
তুমি দেখবে আমি আছি।
তাদের মধ্য থেকেও হাসছি নিষ্পাপ হাসি।

দেখতে পাচ্ছো চারিপাশে যতরকম জীব,
বেঁচে থাকার জন্য যারা রয়েছে উদগ্রীব,
তাদের মধ্যেও আমি আছি।
হ্যাঁ, সবার মধ্যেই আছি আমি।
আর কেমন করে বলবো বলো?
আর কী করে বোঝাবো তোমায়?
এই যে তোমার হাতে এই খাতা,
এর পাতায়-পাতায় লেখায়-লেখায় আমি ঠাসা।
তোমার চারিধারে যে পরিবেশ রয়েছে,
তার সবজায়গায় আমার অবস্থান।
শুধু খুঁজতে জানতে হবে তোমায়,
তোমারই মনের মধ্যে রয়েছি আমি,
শুধু দেখতে জানতে হবে তোমায়।

উদ্দেশ্যহীন

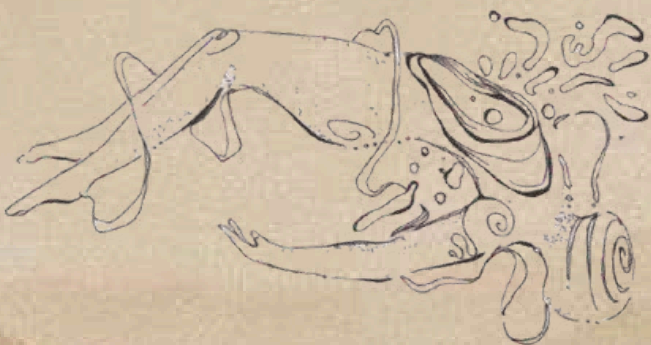
একদা পড়েছিলাম এক কবিতা — ‘ছন্নছাড়া’,
বোধহচ্ছে, আজ আমিই সেই পথিক — পথের হারা;
অনেকেই পরামর্শ দেয় আমায়, কতরকম করে মন্তব্য,
কিন্তু কেউ বলতে পারে না আমার সঠিক গন্তব্য।

পুথিগত পড়াশোনা তো তুলে রেখেছি লাটে —
আর নিজে পড়ে থাকি সেই খোলা মাঠে।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কল্পনা করি আনমনেতে,
যে কী আছে, আমার কপালেতে?

ক্রমে হয় সূর্যোদয় — হয় সূর্যাস্ত
তবু এখনো আমি ব্যস্ত হবার জন্যে কাজ খুঁজতে ব্যস্ত!
তাই জীবনের এত ব্যস্ততায় মধ্যেও ভাবি, কী হয়ে যেত?
যদি আমার জন্মের কারণটি ভগবান আমায় বলে দিত?

আমার এখনো নাই কোনো লক্ষ্য,
কারণ, জানিই না আমি কোন্ কাজে দক্ষ?
এখনো বেছে নিতেই পারিনি কোনো কর্ম নির্দিষ্ট
অথচ, সবকিছুতেই যেন আমার কিছু ইচ্ছে আছে অবশিষ্ট।

জোয়ারের জল যতক্ষণ সমুদ্রতটে থাকে-উঠে —
চঞ্চল ছেলে স্কুল থেকে যতক্ষণে বাড়ি পালায় ছুটে —
সূর্যের আলো যতক্ষণে পৃথিবীতে এসে ঠেকে, —
ততক্ষণই আমার মনে কোনো লক্ষ্য স্থির থাকে।



কথায় সত্যিই বলে —

‘মন আলোর চেয়েও তীব্র বেগে চলে।’
তাই, কখনো জীবনে অভিজ্ঞতার উপলব্ধির জন্য —
হতে চাই যাযাবর — বন্য,
হয়তো, আজ মনে-মনে নিজেকে বৈরাগী মনে করি
তো কাল আবার মোহ-মায়ার কবলে পড়ি।
ছুটতে চাই আমি বিশ্বের বাহিরে-অন্তরে
ঘুরে বেরাতে চাই দেশ-দেশান্তরে।

কখনো ভাবি, হবো ‘শ্রী’-যুক্ত ‘বিরেকানন্দ’
কিংবা, সর্বস্ব ত্যাগ করে পাবো ‘পরমানন্দ’।
কোনো সময় নিজেকে মনে করি যে বড়ো বিজ্ঞানী —
হাঃ হাঃ! পরক্ষণেই বুঝতে পারি আমি কত বড়ো অজ্ঞানি!

দেশকে ‘মা’ বলি আমি, তাই সৈনিক হয়ে লড়বো —
কিন্তু তাতে যেমন দেহ দরকার, তা কেমন করে গড়বো?
একদিন ভাবলাম, দেশের অবস্থা যা শোচনীয়,
তা নিবারণে আমিই করবো যাকিছু কর্তব্য-করণীয়,
তাই ‘প্রধানমন্ত্রী’ হয়ে আমি — না, না ‘রাষ্ট্রপতি’ —
পাল্টে দেবো পুরো দেশের মতি-গতি!
কখনো এমন ‘আবোল-তাবোল’ দুই ছত্র কাগজে লিখে নিয়ে,
নিজেকে ‘সাহিত্যিক’ মনে করি — একটা ছদ্মনাম নিজেকে দিয়ে!

পেটুকের সামনে রকমারি সব মিষ্টি রেখে দিলে —
যেমন সে বুঝতে পারে না যে কোনটি আগে গিলে!
তেমনি যেন আমার সামনে অনেক দরজা খোলা,
কিন্তু জানি না কোনটি আমার, আমি এতই ভোলা!

আমার ভাগ্য যে উদয়মান — না অন্তগামী,
তা জানেন শুধু সেই অন্তর্যামী।
কবে ভাবতে ভাবতে কাটিয়ে দিই, দিন-সারা —
তবুও পাই না, কোনো কূল — কোনো কিনারা —
কোনো বন্ধু বলে, ‘ভাই, আমরা বেকার! তোরাই আকাশ ছুঁবি’ —
আমি তাকে বলি, ‘না ভাই, অনেকের মতো আমিও ভুক্তভুগি।’

মাঝে-মাঝে দেখে নিজের এইসব কারসাজি —
অন্তরে-অন্তরে আমি, হাসি — তীব্র অট্টহাসি।
এইভাবেই সময় অতিবাহিত হয়ে চলে,
কিন্তু তুমিও জেনো যে, ‘সবুরে মেওয়া ফলে’।



প্রতীক্ষা

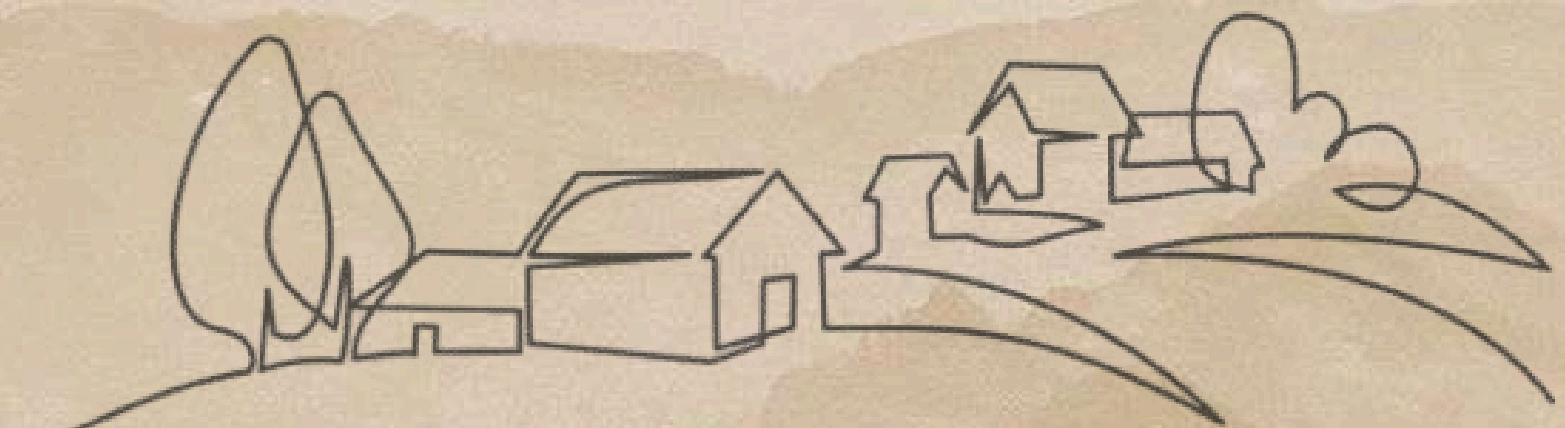


সৌম্যদীপ সরকার

(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২৩-২৫)

শাওন মেঘের বাদল সাজে ভরে ওঠে মন
নদীপারে গোধূলিতে রাঙা আকাশ কোণ
তরগীরা ফিরে আসে , দূরে নদীর তীর
নুলিয়াদের গানের সুরে ভাটিয়ালির ভিড় ।

জাহ্নবীর এই পাড়ে তখন সন্ধ্যা ঘনায় ঘোর,
শুভদিনের আশায় কাটে রাত্রি - দিবা - ভোর ।



The Alchemy



Atreyee Biswas

(2nd year, 2023-25)

The celestial part of yours in me
tells me to jump in.
To jump in and take the leap of faith.
To jump in and trust the rest.
To jump in and let the body float.

The wind is gusting; I am standing against it.
I am about to relive the moment of my birth—crumbling, yet hopeful.
That's what my birthgiver must have felt, maybe!
Did she fear the fall? Did she fear the height?
Maybe I was the leap of faith she took—desperately.
I was the gasp of air she breathed in.
But that breath—I never exhaled properly.
It never came out of me; it got intertwined.

I have always feared heights.
All my dreams are about falling from somewhere.
The tapering fingers of mine never able to hold anything.
And suddenly, it became the grief.
More than what my birthgiver felt.
I took the crumbling, and never touched the hopeful part.

I always behaved like that.
The hope remains intact,
But only on the surface.

Then I met you.

Before meeting you,
I had already figured out that hope clings only to the surface of my body.
But in my soul, I fear to fall.
I knew no one would be able to hold me when I crumble.
I knew everyone would only love the hopeful me—
The hope I never truly harnessed.

Then I met you.
You called me "light."

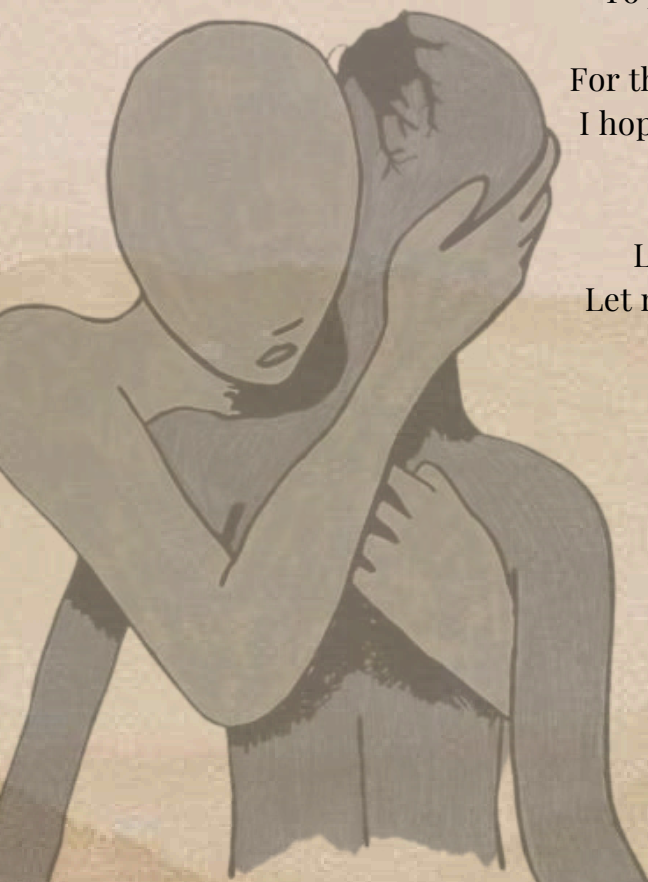
I don't know what will happen
If I show you anything other than being light.
I don't know yet.

Sometimes, I feel insecure.
I am not as much light as I seem to be.
Sometimes, it's terrifying to be real.

But the celestial part of you—
The one I've held inside me since before my birth—
Tells me to jump.
To take the leap of faith again, now, for myself.
To trust the rest.
To jump and let the body float.

For the first time in my life, I hope.
I hope you pull me in before I fall.
I surrender to you.

Let nature decide the rest.
Let nature make us a binary star.



গল্পগুচ্ছ

(Prose)

The Ship That Sailed Within



Aritra Basak

(2nd year, 2023-25)

The last few months of my life has been a relentless quest for the treasure: a box which I believed was worth searching for. Every day and night, I sailed my ship from sea to sea, ocean to ocean, horizon to horizon, just to pass one more day in the infinite depth holder. I did never oppose, for I lost all my strengths, which I never called as lost, but devoted!

I'm unsure of my place at this moment, but I can still make out the east—a bright radiant glow is emerging out from there. I sailed there as long as I could, but suddenly then, the sky created a maze—full of white little dots!

I never stopped sailing for months and I discovered an island where I believed my reward awaited. I tortured myself the whole day digging through layer after layer of earth. My sweat fell like an unyielding stream of sorrow, and then I found it!

The sun was scorching just above my head and as I opened the box after breaking a series of locks, I found nothing but my own shadow at the centre of it, staring back at me!

I couldn't stop questioning myself: was it truly nothing—or was it everything?
Did I cheat my real shadow by chasing it in a treasure box? Or did the world cheat me by showing me nothing but a box—full of lies?!

I returned to my ship with a terrible shock of numbness, I was experiencing the feeling of nothingness. The sun hang low at the west, gradually hiding behind the bare mountain of the Island!

Beside me lay a neglected box—half-broken, scarred, and forgotten. Its lock was rusted and loose, and I had ignored it all this time. After a few quiet moments of absurdity, the maze started appearing in the sky!

In the very remaining light of heaven, I lit the candle that I have been using for months, but every flame went unnoticed, as my line of sight was somewhere out there!

In the dim light of the candle, I opened the box—and there I found it! An old yellowish paper with multiple folds rested at its centre, with no shadows perceived this time, for I held the light in my own trembling hand!

I unfolded it and grasped its total vision and there I was, shocked again for the second time. It was the treasure itself as a whole—a map, which can guide me towards the glowing east—even through the maze of white little dots!

A Birthday Worth Celebrating

It feels like an endless stream of invisible forces is forming a tide against me. I wish I could have been indifferent from the start, for carelessness makes these forces ineffective. But I wasn't. I'm learning, slowly, the art of walking on water—making myself light enough by embracing carelessness.

I began to empty myself while suffocating in the depths of the sea. My taste buds were so saturated that it took me a long time and great effort to realize that the sea water was salty. Only after dissecting myself did I realize I had consumed too much of it. I had become a container of pure salt. Inside me, there was no blood, only dry salt. This turned me into a solid stone.

I couldn't endure it anymore. I started piercing my skin with the sharp anchors of sunken ships, and as I did, the salt began to pour out. Grain by grain, it dissolved into the water, making it denser. And suddenly, I found myself floating, my feet no longer touching the sea floor.

As the salt continued to leave my body, the water grew denser, and the weight I had carried for years started to lift. Slowly, I began to see light dancing through the water.

My journey is still ongoing, but I believe that one day, my head will break the surface, and I'll breathe fresh air again. I'll feel the sunlight on my face. And in that moment, I wish someone would say, 'Happy Birthday.'

Where Numbers Lose
Their Name:
The Edge of Discontinuity

I have already started rolling a dice with one thousand facets in my mind, often exploring the impossibilities. But can there be any impossible facets on a dice? Because if every facet is possible on the surface of the dice, then where are the thoughts of impossibilities coming from? Each outcome intertwines us in different ways; differing on the basis of two parameters—affection and salvation. The existence of either of these is absolutely possible, and the existence of their mixture is not less than probable.

I'm relentlessly bouncing between the thoughts of the perceived thunderstorm of silence, floating on the continuous flow of an estuary, where the river of attachment meets the sea of love, losing its existence completely. Maybe the impossibilities are originating from this continuous flow, simply because of the fact that the numbers are infinite between two discrete numbers.

The improbable exists not on the facets of the dice, but on the edges where one facet meets the other. Even in the discrete possibilities that can originate from a dice, I can still state it for you—the facets are undoubtedly discrete, discontinuous, but the surface is not, and that's what gives birth to impossibilities!

কাকতালীয়



শুভম ঘোষ

(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২৩-২৫)

বই পড়াকালীন মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা বই এর গল্পের সাথে অসাধারণ ভাবে মিলে যায় এবং যার সাথে ঘটে সে নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান হয়।

ওই ভাগ্যবানদের তালিকায় আমিও আছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এরকমই একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা লিখছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক স্তরে পড়াকালীন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর আরণ্যক উপন্যাসটি পড়ার সময় একটি অনবদ্য কাকতালীয় ঘটনা ঘটে। কলকাতায় আমি একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। বাড়িটি দোতলা, নিচের তলায় বাড়ির কর্তা, তার স্ত্রী, কন্যা আর উপরের তলায় আমি থাকতাম।

প্রতি সেমিস্টারের শেষে আমি কোনো না কোনো গল্পের বই পড়তাম। এক শীতকালে পঞ্চম সেমিস্টারের শেষে এরকমই আরণ্যক উপন্যাসটি পড়ছিলাম। বেশ কিছুটা পড়ার পর মনের মধ্যে জঙ্গল, জঙ্গলের মানুষের সরল গ্রাম্য জীবনযাপনের প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হয়।

সেই সময় শীতকাল থাকায়, নিচের তলায় কেউ জোরে কথা বললে উপরে এমনি শোনা যায়। আর তখন মেয়েটির উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় ওরা একটু রাত করে ঘুমাতে যেতেন। এই পরীক্ষার জন্যই মেয়েটির মায়ের শাসন ছিল বিশেষ ধরনের।

যাইহোক এক রাতে খাওয়ার পর বইটা নিয়ে বসেছিলাম। উপন্যাসটিতে কথক কলকাতা থেকে তার এক বন্ধুর জমিদারি দেখাশোনার চাকরি নিয়ে পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গল-মহলে যান। উপন্যাসের এক অংশে কথক সাঁওতাল পরগনার এক বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে পরিচিত হন। সেই সূত্রে রাজার নাতনি ভানুমতীর

সাথে তার পরিচয় হয়। তাদের এই পরিচয় ধীরে ধীরে সম্পর্কে পরিণত হতে শুরু করে। সেই সম্পর্কের মধ্যে শহর আর গ্রামের কাঁচুমাচু ভাব কেটে গিয়ে এক সরল স্বাভাবিক ভাব তৈরি হয়। সম্পর্কের এই অধিকার থেকেই ভাবমতী একদিন কথককে বলে যে, তার আয়নাটা অনেকদিন ভেঙে গেছে, তাই কলকাতা থেকে একটি নতুন আয়না কিনে এনে দিতে হবে। ভাবমতীর এই কথা শুনে কথক মনে মনে ভাবতে শুরু করেন, যোলো বছরের সুশ্রী নবযৌবনা কিশোরীর কাছে যদি আয়না না থাকে, তবে আয়না সৃষ্টি হলো কাদের জন্য?

কথকের এই ভাবনা যেকোনো পাঠকের ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটাতে বাধ্য। যথারীতি আমিও হাসি মুখে বইটা বন্ধ করতে যাব, এমন সময় বাড়ির নিচের তলা থেকে এক শাসন বাণী ভেসে এলো। বাড়ির গৃহিনী উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "নে এবার পড়তে বস, ওতক্ষণ আয়নার সামনে কী করছিস? সরে আয়। তাড়াতাড়ি পড়তে বস।" সেইসময় আমার অবস্থাটা একবার কল্পনা করার চেষ্টা করুন। ঘরে বসে সেদিন প্রচুর হেসেছিলাম। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আমার ওই পড়ার ইচ্ছা আরও বাড়িয়ে তোলে। সত্যিই আয়না বস্তুটি সৃষ্টিই হয়েছে যুবতী মেয়েদের জন্য।

স্নিকিমে হাড হিম

প্রত্যেকের স্কুল জীবনে এমন কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা থাকেন, যাদের কথাগুলো সারাজীবন মনে থেকে যায়। স্কুলের শেষ পিরিয়ডে শিক্ষক ছাত্র দুই পক্ষেরই পড়ানোর আর পড়া শোনার ইচ্ছা থাকে না। সপ্তাহে একদিন শেষ পিরিয়ডে ইংরেজির শিক্ষক সন্দীপ স্যারের ক্লাস থাকতো। ওই ক্লাসে স্যার মহা আনন্দে ওনার বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার নানান রকম গল্প শোনাতেন। ওনার গল্প বলার ধরনটাই ছিল এমন যে শেষ পিরিয়ডেও সবাই শান্ত হয়ে গল্প শুনতো। আমরা প্রতি সপ্তাহে অপেক্ষা করে থাকতাম স্যারের এই ক্লাসটির জন্য। তখন থেকেই কিছু বন্ধু ঠিক করে ফেলি আমরাও বড় হয়ে এরকম ভাবেই বেড়িয়ে পড়বো। কলেজ ওঠার পর ছোটবেলার ওই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ আসে। বন্ধুদের সাথে এরমধ্যে মাত্র দুবার পাহাড়ে যাওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে আমাদের পরিচয় হচ্ছে। পূজোর সময় সবার মোটামুটি ছুটি থাকে, তাই এটাই যাওয়ার মোক্ষম সময়। আমাদের নয় বন্ধুর এবারের ট্যুরের প্ল্যান ছিল সিকিমের রোরাথাং, লাংচুক, নাথাং, গ্যাংটক, তারপর গ্যাংটক থেকে নামচির চারধাম, রাবাংলার বুদ্ধ পার্ক হয়ে পেলিং।

রোরাথাং এ রোংপো চু নদীর স্রোতের শব্দ মনকে মুগ্ধ করেছে। এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ি রাস্তায় দীর্ঘ পথে কম মানুষজনের সবুজে ভরা গ্রাম লাংচুকে পৌঁছে, তার শুদ্ধ বাতাসে শরীরকে সতেজ করেছে। ধূলোবালি ভরা কলকাতার ঘেঘাঘেঘি করা ঘরবাড়িতে অনেক লোকজনের চৈচামেচির মাঝে থাকতে থাকতে মন যখন অতিষ্ঠ হয়ে যায়, পাহাড়ের এই গ্রামগুলিই তখন মোক্ষম ওষুধের কাজ করে। নাথাং উপত্যকার ২°সেলসিয়াসের হাড কাঁপানো ঠান্ডা আমি চিরকাল মনে রাখবো। বাবা মন্দির, নাথুলা, ছাঙ্গুলেক হয়ে আমরা গ্যাংটকে পৌঁছাই। এবার আমাদের ভ্রমণের শেষ অংশ গ্যাংটক থেকে পেলিং।

গ্যাংটকের হোটেল থেকে আমাদের বেরানোর কথা সকাল ৭টা নাগাদ, অনিচ্ছাকৃত কিছু কারণবশত গাড়ি আসে সকাল ১১টায়। সেই সুযোগে আমরা এম. জি মার্কেটে সকালের প্রাত ভ্রমণ সেরে নিই।

পেলিং এর উদ্যেশ্যে গাড়ি রওনা হয়, চারপাশের সবুজ পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছাই চারধামে। ভারতের বেশীরভাগ তীর্থক্ষেত্রের অনুকরণে অনেক গুলি মন্দির আছে এই চারধামে,

মোটামুটি সব তীর্থস্থান দর্শন হয়ে যায় এখানে এসে। এরপর রওনা দিলাম রাবাংলার দিকে, ততক্ষণে দিনের আলো কমতে শুরু করেছে, আর তার সাথে শুরু হয়েছে হালকা বৃষ্টি।

আমাদের গাড়ির ড্রাইভারের কথা আলাদা করে বলতেই হবে আসল ঘটনাটা বলার জন্য। দেরি করে আসার জন্য সবার কাছে আগেই সরি বলে নিয়েছে। ওর চোখ মুখ দেখেই ওর শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েক মুহূর্তের পরিচয়েই আমাদের সাথে বন্ধুর মতো মিশে গিয়েছে। আর এই পরিচয় থেকেই ও বলেছিল, গ্রাজুয়েশনের পর কোনো বাধা ধরা চাকরি ওর পছন্দ হয়নি, তাই সঙ্গী করেছে ওই গাড়িকে। গাড়ি চালানো শুধু ওর পেশা নয়, পাহাড়ের এই রহস্যময় সৌন্দর্য টুরিস্টদের দেখানো ওর নেশা। জীবনে ওর মতো ভদ্রলোক অনেক কম দেখবো তা ওর সাথে পরিচয় হয়ে বুঝতে পেরেছি।

যাইহোক এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা মতোই চলছিল। রাবাংলাতে পৌঁছে ড্রাইভার দাদা বললো, পেলিং এর হোটেল থেকে ফোন করেছে, বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তা খারাপ, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। রাবাংলায় বুদ্ধপার্কে হালকা কুয়াশায় ঢাকা তথাগতর মূর্তির সামনে আমরা অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু ড্রাইভার দাদার ওই কথাটার জন্যই আমরা সময় জ্ঞান হারাতে পারিনি, তাড়াতাড়ি গাড়িতে ফিরে এলাম, গাড়ি চলতে শুরু করল। বৃষ্টির মধ্যেই সন্দের অন্ধকার চারপাশ ঢেকে দিলো। বৃষ্টির সাথে রাস্তা খারাপ থাকায় গাড়ি বেশি জোরে যেতেও পারছে না। মনে হচ্ছে ভগবান যেন সব বৃষ্টি আজকেই ঢেলে দিচ্ছে। রাস্তার একপাশে থাকা একটা ছোটো গাড়িকে আমাদের ড্রাইভার দাদা বললো, আগে আগে যেতে আমরা পিছনে যাব। পাহাড়ি ড্রাইভারদের মধ্যে এক অভূত সম্পর্ক, ছোটো গাড়ি টা কোনো আপত্তি না জানিয়েই আগে আগে চলতে আরম্ভ করল। রাস্তায় গাড়ির হেডলাইট আর অনেক দূরে দূরে থাকা দোকানের আলো ছাড়া চারপাশে কোনো আলো নেই। বেশ কিছুক্ষণ ওরকম ভাবেই চললো, আর মিনিট ৫০ এর মধ্যে আমরা পেলিং পৌঁছে যাব। কিন্তু লেগশিপ-গেজিং এর মাঝামাঝি এক জায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো। জানাগেল আমাদের গাড়ির দেড় গুণ আকারের একটা পাথর পড়ে আছে রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি। প্রায় ১০-১৫ টা গাড়ি ওই অন্ধকার পাহাড়ের বুকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে সবাই নেমে পাথরটাকে সামনে থেকে দেখব বলে এগিয়ে যেতে লাগলাম, কিছু লোক নিষেধ করলো,

ললো এখনও ওপর থেকে মাটি পড়ছে। তাই দূর থেকেই গাড়ির হালকা আলোতে দেখলাম বিশাল পাথরটা রাস্তার মাঝখানে গর্বের সাথে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আবার বৃষ্টি শুরু হলো আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। বেশ ঘন্টা দুই এভাবে আমরা আটকে আছি। সবারই বাড়ি থেকে ফোন করেছে, সবাই এক এক রকম গল্প বানিয়ে বাড়িতে বলেছে যে সব ঠিকঠাক আছে। ওতক্ষণ অন্ধকার পাহাড়ের অসুরক্ষিত স্থানে থাকায় বুকের খাঁচার মধ্যে হৃদয়ের ছটফটানি সবারই বেরে গেছে, তবে সবাই আবার বাকিদের সাহস জোগানোর চেষ্টাও করছে। রাস্তা ঠিক করার কর্মচারীরা এলো, সারানোর কাজ শুরু হলো। মনে মনে নিশ্চিত হলাম আর কিছু সময় পরেই পেলিং এর হোটেলে চলে যাব। তখনই পেটের মধ্যে খিদেটাকে অনুভব করলাম, মনে পড়ল সারাদিন তেমন ভারী কিছু খাওয়া হয়নি। কিন্তু সেদিন মনে হয় তথাগত আমাদের ডাকছিলো, আর একবার তার ওই রূপ দর্শনের জন্য। রাস্তা ঠিক করার বড়ো মেশিনটাই ভাঙা রাস্তার গর্তের মধ্যে আটকে পড়েছে। সেই রাতে আর রাস্তা ঠিক হওয়া সম্ভব নয় সেটা নিশ্চিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম সারা রাত কি আমার এইভাবেই বসে থাকব?

আমাদের ট্যুর অপারেটর আর ড্রাইভারের যৌথ উদ্যোগে রাবাংলায় ওই রাতেই হোটেল পাওয়া গেল। গাড়ি ঘুরিয়ে চারপাশ পুরোপুরি অন্ধকার এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে রওনা হলাম। সেই রাস্তাও মোটেও সুবিধার নয়, অন্ধকারের মধ্যে তা যেন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। ড্রাইভার দাদার অসাধারণ দক্ষতায় আমরা রাবাংলার হোটেলে এসে পৌঁছালাম। সারাদিন পেটে ভাত পরেনি, এই কথাটা মাথায় আবার চাগাড় মেরে উঠল। গরম ভাত, ডাল, সবজি, চিলি চিকেন প্রায় নিমেষের মধ্যে শেষ করে ফেললাম। খাবারের স্বাদ তখন প্রায় অমৃতের মতো মনে হয়েছে। খাওয়ার টেবিলেই সবাই মিলে ড্রাইভার দাদার অসাধারণ দক্ষতার প্রশংসা করে ধন্যবাদ জানালাম। সেও হাসিমুখে আমাদের অভিবাদন জানালো।

পেলিং না যেতে পারায় সবাই মনে মনে হতাশ হয়ে ছিলাম। কোনো কারণ ছাড়াই আমি এমনিই সবাইকে বলেছিলাম, মন খারাপ করিসনা, দেখবি কাল সকালে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন পাবো। পরের দিন সকালে সত্যিই আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার কিছু অংশের দর্শন পাই, আর মাউন্ট পান্ডিম অপার্থিব রূপ নিয়ে ভগবান বুদ্ধের মাথায় মুকুট হয়ে আমাদের দর্শন দিয়েছেন।

আমার কথাটা যে এই ভাবে মিলে যাবে তা আমি নিজেই ভাবিনি, কয়েকজন আমার সাথে হাত মিলিয়ে ছিল ওই ভবিষ্যৎ বাণীর জন্য। সেই দিনই পাহাড়ের ওই নীরব সৌন্দর্যকে বিদায় জানিয়ে আমরা রওনা দিলাম ধুলোবালি চিৎকার চৈচামেচি ভরা কলকাতার দিকে।

বৃষ্টির রাতে ধস পরা অন্ধকার পাহাড়ি রাস্তায় ওরকম ভাবে আটকে পড়ার অনুভূতি সত্যিই মনকে রোমাঞ্চিত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অনুভব করতে হলে প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনাও সহ্য করতে হয়। যারা পাহাড়ে গেছেন তারা নিশ্চয়ই এরকম কোনো না কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন বা হবেন, তার সত্ত্বেও নিশ্চয়ই অনুভব করবেন যে, পাহাড়ের মাদকতা আপনাকে টানছে।



Dead Poets Society



Sayan Dutta

(2nd year, 2023-25)

A school named Welton Academy. Full of orthodox rules, there, students are chasing their careers in a monotonous way. Although most of them have no passion for those things. Everybody is just competing with each other as if this is a game. But suddenly, one person comes like a storm, randomizing everybody's thoughts and giving them a different perspective on thinking, teaching them the value of life. And some whisper is suddenly roaming around, "Carpe-diem". Then every student started to cheer, "O Captain, my Captain." I am talking about the movie "Dead Poets Society" directed by Peter Weir and written by Tom Schulman. The movie has many aspects to talk about, like technicalities, cinematography, acting, etc. But I want to discuss the message behind this story, which I got as an audience.

We can imagine those characters present in the movie as different shades of us. One is passionate about their dream but can't pursue it because of many adversities. Neil represents this character. There are some thoughts of fear that exist in our minds, like Todd's. For which we can't even dare to say something or do something. There's also a daring being latent in us, like Dalton in the movie.

Parameters of these features are different for different humans. Many of us can't even control it. Therefore, we become confused, directionless. And for this reason, everybody

needs an "O Captain, my Captain" in our life who will navigate our ship. Mr. John Keating is representing this character. He is a newly arrived English teacher who teaches poetry. His way of teaching is different, and that attracts the students. His first appearance in the class was so charming. Suddenly, he entered the class whistling. By this, the whole class got curious, and a flow of energy came into the class. Then he introduced himself. On that day, he quotes a line from a poem. There was that famous word "Carpe-diem", which means "Seize the day". Actually, every one of us is thinking about the future, and that's good. But we start to overthink and get depressed. And this thought does not allow us to live in the present. Our lives is very uncertain. We don't even know what will happen in the next moment. What can we do? Rather than overthinking, we can just learn from the past and do something in the present. So spend the time qualitatively, do what you like to do, and try to live every moment. That's how we can follow our dreams, bring some happiness, and mostly we will succeed in adding some value to our small lives. When he is talking about poetry, "we don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion."

Medicine, Law, Business, Engineering: these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry-beauty-romance-love, these are what we stay alive for.” Great lines. This is how we can love our life, doing such things which give us happiness, add value, and give a true meaning of living. In one scene, all of a sudden, he stood on the table to make everyone understand that we must constantly look at things in a different way. “Find your own walk.” To pull out the creativity from us, we must see our nature more deeply. We should keep practicing to observe things from another perspective to think out of the box. That’s what we can learn from Mr. Keating.



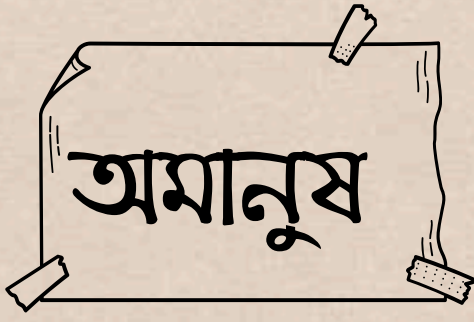
There are many adversities in our lives. Those repulse us to follow our dreams. We start to care about society's comments. Then we start to doubt our commitments, our confidence. And gradually we try to kill our existence, our voice. That's how Neil killed himself when he wasn't allowed to follow his dream as an actor.

In that situation, what can we do? But a certain hope still exists in us. After all, all of us want to live. And that time again we rethink our Captain's verse inside our mind. Arouse our daring and kill the panic in us, reborn from the ashes like the Phoenix bird and make a better self who is invincible and determined to their ambition. In Captain's words, “I sound my barbaric yawp over

the rooftops of the world.” This dialogue is said for Todd. In the movie, the character Todd Anderson is like that. Who is always frightened, an Introvert in the group, and has no courage to think what he wants. There is a secret friend's circle named “Dead Poets Society”. They do their adventure secretly at night, go to a place, and discuss poetry that can be self-written or anything. Even at first, Todd did not want to join this society. But after Neil's death, who was his roommate? He suddenly changed. When the school authority and Neil's parents started to blame Mr. Keating for Neil's suicide, the authority decided to dismiss him from teaching. At the time of Mr. Keating, only Todd starts to protest. After seeing him, many students have joined. And that sound “O Captain, my Captain” is truly converted into the yawp. I think that's the best farewell for a teacher. That scene is magical.

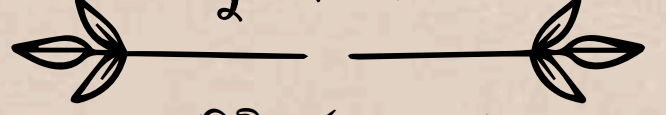


At last, we are here. That life exists and identity. That the powerful play goes on, and we may contribute a verse. And that word is continuously echoed in our mind, “Carpe diem”, “Seize the day”.



অক্ষর হালদার

(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২৩-২৫)



কাজের জন্য একবার উত্তরবঙ্গে রওনা দিছি। শিয়ালদা স্টেশন থেকে রাতের এক্সপ্রেস ট্রেনে করে পরদিন বেলায় নামবো নিউ জলপাইগুড়িতে। মাসটা ডিসেম্বর, ফলে নন এসি স্লিপার ক্লাসের টিকিট সাথে নিয়েই উঠে পড়লাম ট্রেনে। নানা রকমের লোকজন আর তাদের জিনিসপত্রের ভিড়ে আমার সিট টার কাছে পৌঁছুতে মিনিট সাতেক লেগে গেল। লাগেজ নিয়েই তারপর উঠে গেলাম আমার সাইড আপার বিছানায়। লাগেজ বলতে আমার শুধুমাত্র একটা পিঠের ব্যাগ আর একটা ছোট খাবারের থলি। তাতে করে বাড়ি থেকে রুটি আর মাংসের তরকারি নিয়ে এসেছি। এই দুটো খাদ্যের সংমিশ্রণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাছাড়া মা এটা যা বানায় না ! এক কথায় অসাধারণ।

আমি একটু অন্যান্য মানুষদের পর্যবেক্ষণ করতে ভালোবাসি। মানে ধরুন কে কার সাথে কিরকম আচরণ করছে বা কি কথা বলছে, কার ব্যক্তিত্ব কিরকম, এইসব যাচাই করার একটা অভ্যেস আছে আমার। যেহেতু তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাইনা তাই বদঅভ্যেস এর তকমাটা দিলামনা। আর সে জন্যই ট্রেনের সাইড আপার জায়গাটা আমার নিজের পক্ষে একদম মানানসই লাগে। বেশ চারদিকটা দেখতে দেখতে যেতে পারি। আমার সামনের ছটা সিটের সবগুলো এখনো ভরে ওঠেনি। এখনো অর্ধি সামনে চারজন আছেন। দুজন লোক আর দুজন স্বামী স্ত্রী বলে মনে হলো। ভদ্রলোক দুজনের একজন এসে থেকেই আপার সিটে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাতের ট্রেন, আশ্চর্যের কিছু নয়। পাশের সিটগুলোতে তাকাতেই দেখলাম বেশ মোটাসোটা এক পরিবার তাদের খাদ্যের ঝুলি খুলে বসেছেন। কি যে খাচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না তবে বেশ সুন্দর গন্ধ নাকে এসে ঠেকছে। মনে পড়ে গেল ব্যাগ এ থাকার রুটি-মাংসের কথা। তবে এটা শুধুই গন্ধখিদে। শরীরে খাদ্যের অভাবে যে খিদেটা পায় তা না আসলে আমি ওই টিফিন বাক্স খুলবোই না। এতে খাবার টাও বেশ জমিয়ে খেতে পারবো আর হজমও ভালো হবে।

চোখ সামনের দিকে ফেরাতেই দেখলাম আরেকজন লোকও শুয়ে পড়েছেন আর ঐ স্বামী স্ত্রী বসে গল্প করছেন। তবে আমার নজর কাড়লো যেটা, সেটা হলো ফাঁকা সিট দুটো দখলকারী ব্যক্তিবর্গ। তিনজন মানুষ। মা এবং তার দুই ছোট ছোট ছেলে। মা এর শরীরে একটা বহু পুরোনো হালকা ছেঁড়া ময়লা কমদামি শাড়ি। ছেলেদুটোর একজনের হাফ প্যান্ট আর একটা ছোট হয়ে যাওয়া ময়লা শার্ট যার মাত্র দুটো বোতাম লাগানো, বাকি বোতাম গুলো নেই। আরেকটি বয়সে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং শুধু একটা হাফ প্যান্ট পরে। বেশভূষা দেখলে মনে হয় এরা বস্তিতে থাকে। রুগ্ন শরীর, হাড়গুলো দেখা যায়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে কিছুদিন খেতে পারেনি। তবে এরা এই ট্রেন এ যাচ্ছে কোথায় ? টিকিটই বা কাটলো কিভাবে ? এইসব নানা প্রশ্ন মনকে বিদ্ধ করে চললো। ভুল ট্রেনেও তো উঠে থাকতে পারে !

ট্রেন ছেড়েছে বেশ কিছুক্ষন হলো। ওই মা সিট এর উপর হাঁটু মুড়ে বসে আছে। যেন কতকি ভাবছে। এ জগতের কঠোরতার হিসেব কষছে বোধ হয়। তবে ছেলেদুটো অবাক হয়ে চারদিকে দেখছে। আর কিছুক্ষণ পরপর, নিজেদের মধ্যে সেসব নিয়ে কথা বলে হাসাহাসি করছে। ওদের এই হাসিটা আমার কাছে অসম্ভবের মতো ঠেকে। ওই রুগ্ন জীর্ণ শরীর আর পেটে খিদে নিয়ে কিভাবে ওদের ওই শুষ্ক ঠোঁটদুটো ভেদ করে বেরিয়ে আসছে আর্দ্র হাসি তা আমার মাথায় ঢোকেনা কোনোমতেই। দুই স্বামী স্ত্রী যেন ওদের উপস্থিতিতে বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। যদিও তারা দুজনও বাকি যাত্রীদের মতো শুয়ে পড়েছেন খাওয়া সেরে, মিডিল বার্থে। আমি এখনো খাইনি। খিদে পায়নি বললে ভুল বলা হবে। ওই জীর্ণ দুটো শিশুর সামনে রুটি

ফেসবুক

মাংস উদরস্থ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝে একবার মনে হলো যে ওদের দিয়ে খাই। তবে ওদের তো আমি চিনিইনা। দেবই বা কেন ? তাছাড়া এখন আমি নিশ্চিত যে ওরা বিনা টিকিটের যাত্রী। হয়তো লোকাল ট্রেন ভেবেই উঠে পড়েছে। টিকিট চেকার আসলে নামিয়ে দেবে। তারপর না হয় খাবো। কিন্তু ওরা যাবেই বা কোথায় এই রাতের বেলা কোনো অজানা অচেনা স্টেশনে নামিয়ে দিলে ? মানবিকতা, মূল্যবোধ এবং অন্যান্য কিছু অনুভূতির দ্বন্দ্ব ট্রেন এগিয়ে চললো।

ট্রেন যখন বালি ব্রিজ পার হচ্ছে, তখন টিকিট চেকার এলেন। আমার টিকিট দেখে তারপর ওই তিনটে জীর্ণমূর্তির দিকে তাকালেন। মুখ দিয়ে একটা অস্বস্তিসূচক আওয়াজ বের করে তাদের বেশ রাগত স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন, "টিকিট আছে?" ছেলেদুটো মায়ের কোলে মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছিল। মা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো চেকারের দিকে। সে দৃষ্টিতেই চেকার পেয়ে গেল তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর। মহিলার ঘাড় ধরে চেকার নিয়ে গেলেন দরজার দিকে। ঘুম ভেঙে ছেলেদুটোও ভয় পেয়ে মায়ের পিছনে দৌড়ালো। সম্ভবত পরের স্টেশনে নামিয়ে দেবে। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কে একজন বলে উঠলো, "এইসব অমানুষগুলো যে কোথেকে আসে ?" আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সারা পৃথিবী জুড়ে এইভাবে বেঁচে থাকা অসংখ্য অমানুষের মুখ, তাদের শিশুরাও হাসে, খেলা করে। রাত্রির নীরবতায় সৃষ্ট বিঘ্নতা কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার মিলিয়ে গেল যাত্রীদের ঘুমের ভিতর। তবে, আমার রুটি-মাংসটা ওভাবেই পড়ে রইলো।

অনলাইনের সবুজ বাতিটাই যেন সব। ওটাই ধ্যান, ওটাই জ্ঞান। ওটার জনেই কি তবে জীবনের প্রতিটা কণা ঝুঁপে পেতে ছিল ? অপেক্ষায় ছিল কখন এক সমুদ্রসমান অন্ধকারে জ্বলে উঠবে ওই ছোট সবুজ আলো। না, জোনাকি নয়, তুমি অনলাইন হয়েছ।

এককালে কবিতা পড়তে, এককালে আমিও পড়তাম, তখন ছিলোনা কোনো বন্দি দেয়াল। শুধু ছিল মনের ভিতরে সারাক্ষণ উড়ে চলা একটা ফিনিক্স পাখি। এখনও ফিনিক্সটা বসে আছে সেখানে, তবে তাকে পাখি বলা মনে হয় যাবেনা। তাই হয়তো এখন কবিতাগুলো পড়তে মন আনচান করেনা, তবে তাতে সমালোচনার অভাব বোধ করি হয়না। দুপুরের প্রচণ্ড রোদে, ট্র্যাফিকে আটকে আছে গরম ট্যাক্সিটা, হাঁসফাঁস অবস্থা। জানলা খুলে মুখটা সামান্য বের করে আছি, যদি একটু হাওয়া দেয়। তখনই হঠাৎ, সবুজ আলো। না, সিগনাল দেয়নি, তুমি অনলাইন হয়েছো।

আজকের দিনে মানুষের দেখা করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, বই পড়ার দরকার আর নেই। পাশাপাশি বসেও আমরা সবুজ আলোয় চেপে চলে যেতে পারি মিস্ত্রি ওয়ের দুটো বিপরীত প্রান্তে। ভেবে দেখেছি বটে, পৃথিবীটা সত্যিই ছোট হয়েছে, তুমি আর আমি এভাবেই তত দূরে সরে গেছি, "তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে"। সেই বিশাল মহাকাশে হাতড়াতে হাতড়াতে পৃথিবীটা খুঁজে চলি, যেটা ছোট হয়ে গেছে। "চাঁদের পাহাড়"-এ যেরকম গুহার ভিতরে পথ হাতড়ে শেষমেষ বেরুনোর আলো দেখেছিলাম, সেভাবেই যেন দেখতে পাই, একটা সবুজ পিন্ড। না, পৃথিবী নয়, আমি অনলাইন হয়েছি।।



ধুলো আবিষ্কার

আমার বাড়িটা রাস্তার ধারে। সারাদিন গাড়ি আর মানুষের ঢল বয়ে চলে। ফলে, দুর্ভাগ্যবশত প্রচণ্ড পরিমাণে ধুলো ঢোকে ঘরে। কিছুদিন অন্তর অন্তর পরিষ্কার করতে হয়। সেরকমই একদিন ঘরের চারিদিক পরিষ্কার চলছে। আলমারির মাথা থেকে টেবিলের তলা, প্রচুর ধুলো। মুখে একটা রুমাল বেঁধে করে চলেছি যুদ্ধ। সব শেষ করে হাত দিলাম সিলিং ফ্যানে। হঠাৎ, কেন জানিনা মনে হলো ফ্যানের ধুলোটায় কিছু গড়বড় আছে। বাড়ির সমস্ত আসবাবের উপরে ধুলো জমে, কিন্তু ফ্যানের নিচের দিকে কেন ধুলো জমছে, মাধ্যাকর্ষণ সবকিছুকে নিচের দিকে টানা সত্ত্বেও। এ তো বড় ভাবনার বিষয়। শুরু করা যাক গবেষণা।

আচ্ছা ওগুলো আদৌ ধুলো তো? নাকি অন্য কিছু? না, এ যে দেখি একদম বিশুদ্ধ ধুলো। আবার আরো ভালো করে দেখলে দেখা যায় ব্লেন্ডগুলোর একদিকে ধুলোটা বেশি অন্যদিকে কম। এরকম কেন হচ্ছে বাপু।

রহস্য উন্মোচনের প্রথম ধাপে সারা বাড়ি খুঁজে ফেলি ফ্যানের মতো অন্য কোথাও এরকম upside down ভাবে ধুলো জমেছে কি না। নাঃ কোথাও পেলামনা। এবার দ্বিতীয় ধাপ, বের করতে হবে যে আর পাঁচটা আসবাবপত্রের সাথে ফ্যানের মূল পার্থক্যটা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরই খুলে দিলো নতুন দরজা। একমাত্র ফ্যান ক্রমাগত ঘুরতে থাকে, সর্বদা গতিশীল, অন্যান্য বস্তু কিন্তু স্থির অবস্থায় থাকে। ব্যাস, এই গতির জন্যেই তার মানে ফ্যানের ব্লেন্ডে এই বিশেষ ভাবে ধুলো জমছে।

এবার তৃতীয় ধাপ, ফ্যানের ব্লেন্ডের ধুলো মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে ঝুলে আছে, তার মানে নিশ্চয়ই তাদের উপর থেকে কেউ টানছে। নিউটনের সূত্র অনুযায়ী প্রতিটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে, ফ্যানও কি তাই ধুলোকে আকর্ষণ করছে? কিন্তু না তা কিকরে হবে, তাহলে তো অন্যান্য বস্তুর গায়েও একইভাবে ধুলো জমতো। তাছাড়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ওই ক্ষুদ্রে আকর্ষণের থেকে অনেক বেশি। ফলে ফ্যানের কোনো gravitational

force এখানে ধুলোকে আটকে রাখছেন। আর কি ধরনের আকর্ষণ হতে পারে? চৌম্বক আকর্ষণ! যদি তাই হয়, তাহলে তো ওই অঞ্চলে চৌম্বক ক্ষেত্র থাকবে। কিন্তু এভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ার কোনো রকমের কারণ খুঁজে পেলামনা। তাও নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটা চৌম্বক শলাকা কে ব্লেন্ডের কাছে আনলাম। কোনো বিক্ষেপন নেই। মানে চৌম্বক ক্ষেত্র ওখানে নেই। তাহলে কোনো প্রকার চৌম্বক বলও এখানে কাজ করছেন। তবে কি কোনোভাবে তড়িৎ আকর্ষণ কাজ করছে?

তড়িৎ তো দু ধরনের জানি, এক স্থির তড়িৎ, দুই চল তড়িৎ। চল তড়িৎ তো ফ্যানের কেন্দ্রকের মধ্যে থাকে তারের ভিতর, ব্লেন্ডে তো থাকেনা। পড়ে রইলো স্থির তড়িৎ। স্থির তড়িতিক আকর্ষণের জন্য তো দুটো বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনের তারতম্য ঘটতে হবে এবং বিপরীত আধানগ্রস্ত হতে হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে কি তাই হচ্ছে? ছোটবেলায় পড়েছিলাম চিরুনি মাথায় ঘষে যদি ছোট ছোট কাগজের টুকরোর কাছে নিয়ে যাই তো আকর্ষণ করবে। ইউরেকা!

ফ্যানের ব্লেন্ড আর বাতাসে থাকা ধুলোর মধ্যে স্থায়ী স্থির তড়িতিক আকর্ষণ কাজ করতে গেলে ব্লেন্ড এবং বাতাসের ধুলোর মধ্যে ইলেকট্রনের আদান প্রদান হতে হবে, এবং তার জন্য চাই ঘর্ষণ। বলাই বাহুল্য, ফ্যান যখন ঘোরে, নিঃসন্দেহে প্রচুর পরিমাণে ধূলিকণার সাথে ব্লেন্ডগুলোর ঘর্ষণ হয়। তার জন্য আধানের তারতম্য ঘটে। যার জন্য ব্লেন্ড এবং ধূলিকণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং আটকে যায়।

সকালেই তো দেখেছি, ফ্যানের ব্লেন্ড একদিকে একটু বাঁকানো হয় যাতে হাওয়াটা নিচের দিকে প্রবাহিত হতে পারে। এই কারণে ব্লেন্ডের সব অংশের সাথে সমান ভাবে বায়ুর ঘর্ষণটা হয়না। পরিষ্কার দেখলাম, ব্লেন্ডের বাঁকানো অংশে (যেটি স্বাভাবিকভাবেই ধুলোর সাথে বেশি ঘর্ষণ করবে) ধুলোর পরিমাণ চোখে পড়ার মতো বেশি। ব্যাস, রহস্য উন্মোচিত।

তাহলে যদি আপনি চান যে ফ্যানের গায়ে ওই নাছোড়বান্দা ধুলো জমতে দেওয়া যাবেনা, তাহলে ফ্যান বন্ধ করে রাখুন। ইঁ্যা, গরমে একটু কষ্ট হতে পারে বটে, শরীর অসুস্থও হয়ে যেতে পারে, তবে তাতে কি, ফানে ধুলো তো জমবেনা!

কোন নগর ?

Manifold রা non Euclidean হলেও তার ভিতরে ছোট ছোট জায়গায় focus করলে Euclidean Geometry খুঁজে পাওয়া যায়। সেরকমই পৃথিবীর ভিতরেও অনেক অপার্থিব পদার্থ বা অপদার্থ খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের মন হয়তো সেরকমই কিছু। সকলের মতে সকলের কাছে ধরা দেয় এই মন, শুধু নিজের কাছেই দেয়না। নানারকমের মন দৃষ্টিগোচর হতে পারে। ছোট মন, বড় মন, খাটো মন, লম্বা মন, সাদা মন, কাদা মন, পাণ্ডু মন, কৌরব মন, ভাবুক মন, চাবুক মন, অবাক মন, সবাক মন ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনটা স্বাভাবিক কোনটা অস্বাভাবিক কোনটা সাধারণ কোনটা অসাধারণ তা জানি না। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত হয়তো ভাঙা মন আর জোড়া মন। কি জানি। তবে সব মনই চায় নিজেকে উজাড় করে দিতে। কিছু মানুষ অবশ্য নিজের মনের কথা নিজের মধ্যেই পুষে রাখে, হয়তো কাউকে বলতে পারেনা কিংবা কেউ হয়তো শুনেও বোঝেনা।

ধরা যাক আপনাকে আমি একটা অদৃশ্য ড্রোন এনে দিলাম। তাতে চড়ে আপনি শহর ভ্রমণে বেড়িয়েছেন। প্রথম কিছু মিনিট ঐশ্বরিক অনুভূতি জড়ো হবে আপনার মনে। তারপর সেই অনুভূতির ঢেউতে নিজের হালটা যেই ধরবেন দেখতে পাবেন অসংখ্য মানুষকে। এভাবেই উড়তে উড়তে আপনি চলে যাবেন কোনো নগরে। কয়েকজনকে "এটা কোন নগর ?" জিজ্ঞেস করার পর জানতে পারবেন "এটা মন নগর।" নামকরণের ইতিহাসে আপনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, মোড়ের মাথায় নেমে এক কাপ গরম চা খাবেন এবং খেয়াল করবেন যে এত সুন্দর চা আগে কখনো খাননি। চা ওলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ড্রোনে বসবেন, খানিক দূরে গিয়ে মনে হবে চা ওলার কাছ থেকে এই চা বানানোর পদ্ধতি শিখে নেওয়া উচিত। তবে হাজার ঘুরেও সেই চা দোকান আর খুঁজে পাবেননা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "তেলেনাপোতা"-র মতো এটাও চির অধরা থেকে যাবে।

মন নগরের স্টেশনে নানা লোকের সমাগম। তার মধ্যে দুটো ছেলে বসে আছে বেঞ্চে। অনেক ট্রেন আসছে যাচ্ছে তবে তাদের যাত্রা ওখানেই থেমে আছে। কেউ ঝালমুড়ি খাচ্ছে, কেউ লেবুজল। কেউ বা ফাঁকা ট্রেনে শুধু হাওয়া খেতে উঠেছে। কেউ আবার আরেকজনকে কবিতা শোনাচ্ছে। সে মন দিয়ে শুনছে। সে হয়তো বোঝে কবিতা লেখার মর্ম। হয়তো বোঝে এক একটা কবিতা লেখার পিছনে কত সহস্র ঘটনার পাহাড় জমে থাকে। এমন সময়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি। আপনার ড্রোনটা হঠাৎ একেজো হয়ে যায়। আপনি দুম করে প্ল্যাটফর্মে পড়েন। আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে, ছুটে আসে রেলকর্মী। কেউ আপনার মাথায় জল দিতে আসে। কেউ বা আপনার থেকে ড্রোনটায় বেশি মনোযোগ দেয়। এরকম মুহুর্তে আপনি বুঝতে পারেন না কি করবেন। দশ টাকার ঘটিগরম কিনে শেড এর তলায় বসেন। বৃষ্টিটা জোর হয়ে ওঠে। বেঞ্চে বসা দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে ওঠে, "বৃষ্টি !!!! " চিলচিৎকার করে উঠে পড়ে একটা চলন্ত ট্রেনের দরজায়। ভিজতে ভিজতে চলে যায় দিগন্তের দিকে। দূরে, আরো দূরে। বৃষ্টি থেমে যায়। চুপচাপ হয়ে যায় চারিদিক। আপনারও বাড়ি ফেরার সময় হয়ে আসে। কিন্তু, আপনি বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন, কখন আবার বৃষ্টি আসবে। ড্রোনটা মুচকি হেসে উড়ে যায়।



পৃথিবী বড় অদ্ভুত

"পৃথিবী বড় অদ্ভুত" এই প্রবন্ধটি নিয়ে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছি আমরা ক্লাস সেভেনের ছেলেমেয়ে। কাল বাংলা পরীক্ষা, সব পড়া হয়ে গেছে শুধু এইটা বাদে। প্রথমে ভেবেছিলাম ছেড়ে দেব। তারপর শুনলাম কবে নাকি স্যার বলেছেন এই লেখা থেকে একটা দুই নম্বরের প্রশ্ন আসবেই। অগত্যা বই খুলে বসে আছি।

প্রবন্ধটায় মূলত লেখক লিখেছেন বড় অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার কথা। তিনি লিখেছেন কিভাবে শান্তির বার্তা বহনকারী মানুষরা ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে। কিভাবে জাগবো বলেও অনেকে ঘুমিয়ে পড়ে, কিভাবে ঘুমাবো বলেও অনেকে জেগে থাকে। সবচেয়ে অদ্ভুত, ব্ল্যাকবোর্ড সাদা হয়ে গেলে নোংরা হয়ে যায়, তবে গায়ের রং কালো হয়ে গেলে নোংরা হয়ে যায়। এই লেখাটির মানে স্যার বোঝাবেন বলেছেন বড় হলে, এখন এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। তবে ক্লাসে যখন পড়ানো হয়েছিল সেদিন থেকে তন্ময় কথাটাকে বড় সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছে। সে প্রতিদিন নানারকম সাবান দিয়ে তার পোষা কালো বেড়াল টাকে চান করাচ্ছে তারপর থেকে।

যাই হোক, কালকে দুইয়ে দুই পেতেই হবে। বাকিটাও পড়ে ফেলি। লেখক একটা গ্রামের গল্প করেছেন। গ্রামে একটা ডিমের দোকান আছে। সেখানে পোল্ট্রিতে গ্রামের সবাই কাজ করে। আবার তারাই পরে সেই দোকান থেকে ডিম কেনে। তারপর একদিন পোল্ট্রির মালিক রোবট ভাড়া করে এনে পোল্ট্রি চালাতে শুরু করেছে। সবার চাকরি খেয়ে ডিমের দামও বাড়িয়ে দিয়েছে এটা না ভেবেই যে কয়েকদিন পর তার দোকানে ডিম কেনার আর কেউ থাকবেনা। এরপর লেখক বলেছেন যে প্রযুক্তির অগ্রগতিই একদিন মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনবে এভাবে। মনে পড়লো অরিন্দম জিঙ্গেস করেছিল ক্লাসে যে প্রযুক্তি মানে কি ? স্যার বলেছিল যে এই যে নানারকম যন্ত্রপাতি বেরুচ্ছে সবই প্রযুক্তি। এই স্মার্টফোন, কম্পিউটার এইসবই। এরপর শুনেছিলাম অরিন্দম বাড়ি গিয়ে তার বাবার মোবাইলটা ছাদ থেকে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল

যে বাড়ির সব প্রযুক্তি ফেলে দেব ছুঁড়ে পুকুরে। তবে তারপরে সবাই আমাকেই ছুঁড়ে দিত জলে আর আমি সাঁতার জানিনা। ফলত, এই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি।

এসব পুরানো কথা ছাড়ি এবার। পড়া মোটামুটি হয়ে গেছে। লেখাটির শেষে একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য অংশে লেখা আছে আরেকটা কথা। সেটা নীচে দিলাম -

"বিঃদ্রঃ- আমার এ লেখা যদি কোনোদিন কোনো পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে দয়া করে 'গ্রামে কিসের দোকান ছিল ?' এইজাতীয় মুর্খদের মতো প্রশ্ন করবেন না। এতে বাচ্চারা কিছুই শিখবেনা।"

স্যার বলেছিলেন প্রবন্ধটা খুব একটা ভালো নয়, অদ্ভুত অদ্ভুত আজগুবি জিনিসে নাকি ভরা। আমার তবে এইসব আজগুবি জিনিসই ভালো লাগে।

পরেরদিন যথারীতি পরীক্ষা হয়। প্রশ্ন আসে, "পৃথিবী বড় অদ্ভুত লেখাটির শেষে বিশেষ দ্রষ্টব্যতে লেখক কি লিখেছেন ?"



Tracing Domestic Life Through Popular Japanese Anime



Mariom Mamtaj

(Batch 2021-23)

In the suburban landscapes of 1970s Japan, Maruko, a third grader lives out slow summer afternoons in a multi-generational household—lounging on tatami mats in front of a whirring table fan as cicadas buzz outside, eating kakigori (shaved ice) with her grandfather, or joining her classmates on field trips where they rest in the shade of large trees and splash in cool, nearby streams.



Decades later, in a crowded apartment somewhere in Tokyo, Mikan and the Tachibana household struggle with the complexities of domestic life: overcooked, mushy rice, cluttered schedules, and a microwave that always seem to win—a quiet reminder of their growing reliance on home appliances amid the hectic pace of modern life punctuated by the fleeting joy of having Hokkaido ramen.

Chibi Maruko-chan and Atashin'chi, separated by a few decades and generations, are more than just family sitcoms. They are living records—animated

archives of how domestic life, urban landscapes, and even the idea of summer have transformed under the weight of modernity.

To revisit these two animated slices of life today is to observe more than just the transformation of Japanese domestic life; the narratives serve as entry points into broader inquiries about modernization, illustrating how domestic spaces across the globe have adapted to the pressures and patterns of contemporary life.

From the lens of environmental humanities, the shift from breezy, communal summer afternoons, local matsuri or bon odori festivals, and other seasonal events and freshly caught fish, from a local market or sometimes brought home by the grandfather for lunch to sealed, air-conditioned apartments, frugal dinners and tightly managed middle-class household budgets like reheated old curry to avoid food waste and filler ingredients like extra vegetables or a small amount of meat to a big pot of vegetable stew so it lasts multiple days—points to more than just changing habits—it reveals how our relationship with the environment has quietly but fundamentally changed, shaped by other socio-economic conditions like inflation, energy demand and increasing resource scarcity. Such shifts are not merely anecdotal but symptomatic of deeper disconnections. As writer and

philosopher Timothy Morton puts it, we now live with ‘hyper-objects’—huge systems like urbanisation and climate change that shape our lives but feel distant or invisible.



While Maruko's world was shaped by the echoes of postwar recovery and tight-knit communities, Mikan's Tokyo unfolds amid the pressures of late-capitalist urban life, shaped by alienation, ecological amnesia, economic stagnation and a redefinition of the family unit. These manga series transcend mere nostalgia—these archive changes in the mode

of domestic life from porous, relational, and entangled with the human and non-human world to fragmented, temporally compressed, and hyper-individualized spheres of existence. Together, they mark a continuum of transformation, encouraging reflection on what is gained, and what is quietly lost, in the name of progress.

The world of Chibi Maruko-chan unfolds in a small, familiar neighbourhood—a post-war suburb modelled on Shimizu-ku. The roads are unpaved, daikons or rows of tomatoes grow wild in the backyard patch behind wooden houses with sliding shoji doors and wooden floors and chabudai (low tables)—like the time Bootaro hosted a roasted sweet potato party there. Children walk to school in little groups, pausing to pick up stones or talk about snacks and bicycles clatter past in no great hurry. There's a quiet intimacy to the streets—a sense that the town breathes with its people.



In contrast, Atashin'chi offers a distinctly modern cityscape. The Tachibana family lives in a compact high-rise urban apartment, likely a 2DK or 3DK—the standard housing unit for a working-class Tokyo household of the early 2000s, complete with a balcony full of flapping laundry, potted plants and pesky crows. There are no visible neighbours. The elevator replaces the front gate; the convenience store and home delivery replace the street vendors. Urban spaces shrink. Outdoor scenes are rare, unlike in the episodes of Maruko-chan, and when they appear, they feel rushed—hurried purple backdrops rather than spaces to linger in.





This shift in setting from low-rise neighbourhoods with schools and local shops within walking distance, rivers and open fields to dense urban and high rise apartment blocks, public transport on paved roads and malls and chain restaurants—reflects a deeper socio-cultural change.

In Chibi Maruko-chan, the neighbourhood is an extension of the home—a social space that fosters connection, mischief, and memory. In Atashin'chi, the city looms impersonal, pragmatic, and closed off. Privacy replaces proximity. The domestic unit becomes more self-contained, but also more isolated. The city is no longer something to explore, but something to navigate—an obstacle course of crowded metro commutes, traffic snarls, deadlines, office exhaustion and constant background noise.

The transition from close-knit neighbourhoods to impersonal apartment blocks illustrates how urban landscapes have transformed, reshaping daily interactions and the sense of community.



In Chibi Maruko-chan, family dinners are a warm, lively affair featuring traditional, home-cooked dishes like miso soup, hambagu (Japanese-style hamburger steak), oden (Japanese fish cake stew) when the weather turns cold, soba noodles, tempura, omelettes and rice. Conversations flow freely around the table—the father often shares stories from work or cracks jokes to lighten the mood, while the grandfather and occasionally the grandmother add their presence, weaving a comforting sense of continuity across generations. The dinner table is a hub of connection, where family bonds are nurtured amid the clatter of chopsticks and casual banter.



Atashinchi, meanwhile, captures a different domestic rhythm. The Tachibana family's apartment is smaller, more compact, shaped by the demands of urban living like modular, cluttered storage areas and modern plumbing. Kitchens are efficient, filled with gadgets like microwaves, chimneys and rice cookers designed to save time. Meals tend to be simple and frugal—natto pizza, omurice, hot dogs, and rice—reflecting a fast-paced lifestyle. The father often occupies a quiet corner, absorbed in his newspaper, embodying a subdued presence amid the household's bustle. Despite the occasional chaos and shouting matches, an unspoken bond weaves through their daily

routines, emblematic of a modern nuclear family navigating urban life.



The siblings, Maruko and her older sister Sakiko, share a room—an arrangement that fosters both quiet companionship and frequent friction and bickering, like when Sakiko scolds Maruko for being irresponsible and not doing her homework as summer vacation comes to an end. But ultimately, there is a deep sense of togetherness and routine. The boundaries between self and family blur, creating a home life that is communal, fluid, and emotionally porous.



Meanwhile, Mikan and her brother Yuzuhiko—have separate rooms, reflecting increased privacy and physical separation within the home. The family still gathers for meals, but the sense of shared space and emotional exchange is muted, replaced by the rhythms of a more compartmentalized, pragmatic household. Devices like cell phones and headphones, often seen in use by both siblings—quietly underscore a generational shift toward inwardness and personal space.



This shift in domestic representation of Japanese pop culture reflects broader societal changes from the nostalgic innocence of the showa era to the idiosyncrasies of Heisei-era households. The slower, more communal days of Maruko's childhood have made room for a faster, more fragmented pace in *Atashin'chi*. Technology connects, but it also isolates. Meals happen quickly or separately, and the shared stories become shorter, microwave meals—like a heated-up cheese sandwich—edging out home-cooked meals. These contrasting portrayals of domestic space and family dynamics reveal how physical environments and emotional rhythms shape, and are shaped by, the evolving nature of familial relationships across generations.

Maruko's mother embodies the archetypal homemaker, patiently managing the household and family meals, while Maruko's father is the quiet provider, less involved in daily family life but respected for his role. This portrayal resonates with a period when Japanese society was beginning to modernize but remained deeply rooted in traditional family structures.



Fast forward to Atashin'chi in the early 2000s, and we see a more flexible, evolving view of gender and family roles. Mikan's mother often balances work outside the home—clipping coupons or hunting for sales at the grocery, with household responsibilities, as seen when she humorously attempts to drive the family car—highlighting mobility and independence and the growing complexity and flexibility of women's roles in contemporary urban life. She also makes time for personal care, such as visiting the parlour for a haircut and styling her bangs, a small but telling sign of changing priorities and modern lifestyles.



Mikan herself pushes boundaries too. She takes on a part-time job to earn extra allowance, showcasing the growing independence and responsibility even girl children can have in modern society—far from the more sheltered childhood Maruko experiences. These glimpses reveal a family adapting to economic and social pressures, juggling busy schedules and shifting roles.

As family dynamics evolve and technology reshapes daily life—bringing with it the growing environmental footprint of modern comforts and more fuss over dripping faucets—it reminds us that behind every hurriedly packed bento box of bland food like meat loaf and satsuma-age (Japanese fish cake), or crowded escalator ride lies a web of social, economic, and ecological

forces quietly redefining home, connection, and belonging.

The evolution of domestic life captured in these two beloved series underscores how deeply intertwined everyday living is with broader societal shifts. As Japan moved from more collective, tangible connections within neighborhoods and rotary phones to highly individualized, technology-mediated urban living, the home itself transformed into a complex microcosm reflecting economic realities and cultural redefinitions.

This comparison not only highlights changing spatial arrangements and family roles but also reveals how modernization influences emotional landscapes, altering how families relate to one another and their surroundings. It points to a growing tension between convenience and connection, efficiency and intimacy, signaling a nuanced negotiation of identity and belonging within contemporary life.



By examining these domestic narratives, we gain insight into how cultural artifacts preserve memory while simultaneously adapting to present challenges—inviting us to consider the future of home and community in



an increasingly fragmented world. Because, ultimately, Maruko and Mikan's worlds are connected by an underlying thread: the enduring quest for belonging and meaning within the ever-changing contours of home. Their stories remind us that as domestic life evolves, it remains a vital site where personal identity, social relations, and cultural memory are continuously negotiated, preserved, and reimagined, infused with the quiet passion of everyday, ordinary and the resistance to change, like Mikan's mother sloppily singing 'red rose of passion'.




নাটক

(Play)



হিজিবিজবিজ

চরিত্রসমূহঃ

১. যতীন সরকার – অবসরপ্রাপ্ত মাস্টার মশাই (দাঁতের অভাবে স্বভাবতই কম কথা বলেন)
২. গোপাল সরকার – অবসরপ্রাপ্ত হতে চলেছেন শীঘ্রই শিক্ষকতা থেকে
৩. ভূপেন মণ্ডল
৪. প্রসেনজিৎ মণ্ডল
৫. পঙ্কজ সরকার – দোকানদার
৬. জয়রাম দাস
- 

প্রথম দৃশ্য



[বিকেল বেলায় খোলা মাঠে যতীন মাস্টার, ভূপেন মণ্ডল আর প্রসেনজিৎ মণ্ডল উপবিষ্ট। এমন সময় পঙ্কজের হাঁসি-হাঁসি মুখ নিয়ে প্রবেশ।]

ভূপেন – কী রে, হাঁসছিস কেন? দোকান বন্ধ নাকি?

পঞ্চজ - না না, আজ বিকালে তো বাজার বন্ধ। (তারপর একটু হেসে নিয়ে) খেজুরের গাছ দেখেছিস?

যতীন মাস্টার – (কিছু বুঝতে না পেরে) মানে?

প্রসেনজিৎ – খেজুরের গাছ দেখাবো না হে! কী বলছিস! কত্ত দেখেছি, কত্ত খেয়েছি খেজুর! কী ভুপেন? হাঃ হাঃ হাঃ! নদীর ধারে কত্ত আছে! যা দেখে আয়, দেখিসনি তো — হাঃ হাঃ হাঃ!

পঙ্কজ – মানুষের মাথায় দেখেছিস?

প্রসেনজিৎ – হ্যাঁ... (তারপর অবাক হয়ে) মা-মানুষের মাথায় ফের কেমন কথা?

পঙ্কজ – তো-আমার সঙ্গে ছশিয়ারি? (তারপর আবার একটু হেসে নিয়ে) যতীন কাকার মাথার দিকে তাঁকা। কাকা, রাগিও না ফের!

[তিনজনে অবাক]

[তিনজনেই জিজ্ঞাসু মুখে পঙ্কজের দিকে চায়]

পঙ্কজ – মাথায় কী নাই? — চুল!

[তারপর পঙ্কজের তীব্র অট্টহাসি]

ভূপেন – তো?

পঙ্কজ – (হাঁসি যথাসম্ভব থামিয়ে) তো শুন। আমি আসছিলাম এখনটাই — তো রাস্তায় একটা ছোকরাকে দেখলাম, এদিকেই আসছিল। (হাঁসি)

ভূপেন – (বিরক্ত হয়ে) তো কী হল? আমরা কোনো ছোকরাদের দেখতে পাই না নাকি?

পঙ্কজ – আরে থাম না রে! শুন তো আগে। তো ছেলেটার চুল দেখেই আমার খেজুরের গাছের কথা মনে পড়ে গেল। (যতীন মাস্টারের দিকে চেয়ে) তা কী বলবো তোমায় কাকা, দেখে আমার হাঁসি থামে না। চুল তো নয় খেজুরের ডাল! হাঃ হাঃ হাঃ। মাথাটা একেবারে খেজুরের গাছ হয়ে গেছে!

প্রসেনজিৎ – (মুখ ভার করে) তো এতে এত হাঁসির কী হলো?

পঙ্কজ – (পেছন ফিরে হঠাৎ কিছুদূরে সেই ছেলেটিকেই দেখতে পেয়ে) ওই দ্যাখ, ওই ছেলেটার চুলের দিকে তাকাও।

[বাকি তিনজনও ছেলেটির খেজুরের ডালের মতো চুল দেখে অট্টহাসি শুরু করলো। এমনকি যতীন মাস্টারও ফোকলা মুখে হাসতে লাগলেন]

[বেশ কিছুক্ষণ পর হাঁসি থামিয়ে]

যতীন মাস্টার – যে যুগ এসেছে —

প্রসেনজিৎ – আরে আমিও সেদিন একটা ছেলেকে যা দেখলাম না, কী আর বলবো।

ভূপেন – (ভঙ্গি করে) কী বলবি মানে? যা দেখলি তাই বল —

প্রসেনজিৎ – (কিছু মুহূর্ত মুখ ভার করে) না, কী আর দেখবো? তেমন কিছু নয়।

ভূপেন – আরে, এমন চুলের বাহার দেখতে পারলে হল! আরে একজনের দেখলাম মাথার এদিক ওদিকের চুল একেবারে ছাটা, আর মাথার উপরে মাঝখানে, সামনে থেকে শুরু করে একদম পেছন পর্যন্ত, তিমি মাছের পিঠের পাখনার মতো চুল খাড়া হয়ে আছে!

পঙ্কজ – আরে বোঝায় যায় না হে। ওদিন একটা ছেলের দেখলাম — এত লম্বা চুল যে গলারও নীচে নেমে যাচ্ছে। আমি তো প্রথমে বুঝতেই পারিনি ছেলে না মেয়ে! ভাবা যায়!

[এমন সময় গোপাল সরকারের প্রবেশ। তিনি যতীন মাস্টারের পাশে বসলেন]

ভূপেন – ওদিন আমি তো দেখলাম একটা ছোরার মাথার পেছন দিকে লিখা ‘ডন্’ —

প্রসেনজিৎ – ওটা বলছো হে! একবার আমি দুর্গা পূজাতে দেখি তিনটে ছেলে পাশাপাশি হাঁটছে, তিনজনেরই মাথা পুরাপুরি ছাটা, শুধু পিছন দিকে একটু লিখা আছে। প্রথম জনের মাথার পিছনে লিখা ‘আই’, মাঝখানে যে ছিল ওর পিছনে লিখা ‘লভ্’, আর শেষের জনের মাথায় ‘ইউ’ লিখা আছে। আর তিনজনেই একই জামা-প্যান্ট পড়ে। কী বলবা বলো!

যতীন মাস্টার – আরে আমার একটা নাতি। ছ বছরের ছেলে তাতেই চুলের যত বাহার! কী গোপাল চুপচাপ কেন?

গোপাল – না! শুনছি তোমাদের কথা —

ভূপেন – খালি শুনছো? বলো না যে কিছু আজ। কী হয়েছে?

গোপাল – কী আর বলবো? মাথার অবস্থা খারাপ। খুব চুল পড়ছে —

ভূপেন – তো কী হলো? টাক্ তো এখনো পুরোপুরি গজাইনি।

[গোপাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভূপেনের দিকে তাকায়]

পঙ্কজ – টাক্ পড়লে টাকা জমে — এই তো টাকের মহিমা।

ভূপেন – ঠিকই নাকি রে? তাহলে তো সবথেকে বেশি সম্পত্তির মালিক যতীন কাকা, তারপর প্রসেনজিৎ —

প্রসেনজিৎ – হুট! চুপ কর। আমার চুল এখনো অনেক আছে। শুধু এই একটু এদিকটাই —

ভূপেন – হাঁ, শুধু মাথার উপরকার সব চুল উড়ে গেছে। আর সামনে কিছু নাই। এই এইটুকুই যা — বাকিসব জায়গায় গভীর জঙ্গল, না?

প্রসেনজিৎ – তোর তো মনে হচ্ছে মাথায় একদম ‘আমাজন’ জঙ্গল হয়ে আছে – যত্নসব!

ভূপেন – ‘আমাজন’ না হলেও, তোর থেকে ঢের বেশি ঘন —

[বলেই সেভ করা চুলে আঙুল সঞ্চালন ও চুলের সৌন্দর্য প্রদর্শন]

প্রসেনজিৎ – হ্যাঁ হল হল। বেশি ঢং দেখাস না।

ভূপেন – (যতীন মাস্টারের কানের কাছে গিয়ে ও প্রসেনজিৎ যাতে শুনতে পায় এমন ভাবে) কত হিংসে দেখেছো!

গোপাল – এই তোরা ফালতু বকিস না তো।

যতীন মাস্টার – আরে, মাথার চুল পড়া, টাক্ পড়া হচ্ছে বংশগত ব্যাপার। আমার দাদুর টাক্ ছিল, আমার বাবারও শেষকালে টাক্ ছিল তাই —

পঙ্কজ – আরে মানে প্রাচীনকাল থেকেই কাকা, তোমাদের এই প্রথা চলে আসছে — সাস্ত্রমতে বোধ হয়!

[পঙ্কজ আর ভূপেনের তীব্র হাঁসি]

ভূপেন – আরে টাক্ হল কর্মের ব্যাপার কর্মের! যেমন কর্ম তেমন ফল। আগের জন্মে নিশ্চয়ই তেমন কিছু করেছে — হয়তো জোর করে কাউকে ন্যাড়া করে দিয়েছিল, না তো কারো টাক্ নিয়ে হাসি তামাশা করেছিল। তাই প্রসেনের এমন হাল এ জন্মে!

প্রসেনজিৎ – আর তুই খুব ভালো কাজ করেছিলিস, না?

ভূপেন – (ভঙ্গি করে) চুল দেখে তো সেই ইঙ্গিতই পাচ্ছি।

পঙ্কজ – (যতীন মাস্টার আর গোপালের দিকে তাকিয়ে একটু জোরেই বলল) তাহলে তুই কী বলতে চাইছিস ভূপেন, গোপালদা আর যতীন কাকা পাপ করেছে খুব?

ভূপেন – (একটু খতমত খেয়ে) না না! সবার ক্ষেত্রেই তো কর্মের ব্যাপার থাকে না! অন্য কারণও থাকতে পারে — থাকে কী, আছে নিশ্চয়ই! রাগ করিও না আবার তোমরা —

গোপাল – এই, চুপ কর তো! ফালতু বকতে পারলে হল!

যতীন মাস্টার – আরে চিন্তা করিস না গোপাল। বেশি চিন্তা করলে চুল পড়ে। আর বয়স হিসাবে তোর চুল একরকম ভালোই আছে —

ভূপেন – হুঁ হুঁ!

যতীন মাস্টার – বয়স বাড়ছে — অমন আধেকটু চুল পড়বেই। বয়সের কাছে সবাইকে —

গোপাল – (গর্ব করে) আবে বয়স! বয়সের কথা আমার সামনে বলিও না। বয়সকে আমি তোয়াক্কা করি না!

ভূপেন – বাপরে!

গোপাল – জোয়ান বয়সে যা যা করেছি — আজকালকার ছেলেমেয়েরা তার কী জানে? এই লঙ জাম্প আর একশো-দুশো মিটারের দৌড়ে স্কুলে আমার কেউ ধারে-কাছে লাগত না। ডিসট্রিক্ট লেভেলেও খেলতে পারতাম, যদি না ওই—

ভূপেন – হ্যাঁ বুঝলাম বুঝলাম! গোপালদা জিন্দাবাদ —

গোপাল – আর তখন আমার যা চুল — তোরা দেখলে চোখ হানাবড়া হয়ে যেত। আর আমি এখনো...

ভূপেন – হ্যাঁ গোপালদা বুঝলাম বুঝলাম। তোমাকে দেখেই বোঝা যায় তুমি কেমন হাট্টাকাট্টা!

গোপাল – (হতাশ হয়ে) আরে সেটাই তো! এমন শরীরে যদি মাথায় চুল না থাকে —

প্রসেনজিৎ – আরে ছাড়ো তো! চুল থাকলেই কি সব? কত্ত বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের টাক্ আছে, তো তুমি আবার কে—

পঙ্কজ – দেখছো গোপালদা? তোমাকে বলছে — "তুমি কে?"

[প্রসেনজিতের, পঙ্কজের দিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকানো ও বিরবির করা]

ভূপেন – থাম্ তো থাম্। (তারপর গোপালকে) গোপালদা, তোমার চুলই তো পড়ছে — তো আমি তোমাকে একটা টেকনিক বলছি, শুনো। মাথায় তেল-হলুদ লাগাবা, ঘা-টা হবে না, আর পিঁয়াজের রস লাগাবা চুল কম পড়বে।

প্রসেনজিৎ – আমাকেও বলেছিল গোপালদা। কাজ হয়নি। ওর কথা শুনিও না —

ভূপেন – সবার মাথায় গোবর থাকে নাকি তোর মতন?

[গোপাল ও প্রসেনজিৎ বাদে বাকিদের সমবেত হাঁসি]

গোপাল – ঠিক বলছিস তো? যদি না কাজ হয়?

ভূপেন – তুমি আর পাঁচটা লোককে জিজ্ঞেস করিও — এই উপায়টাই বলে কিনা।

গোপাল – ঠিক আছে।

পঙ্কজ – আরে, বড় বড় নায়ক-নায়িকাদেরও প্রচুর চুল পড়ে। তো ওরা কী করে? ওরা বিদেশ থেকে কী একটা অপারেশন করে, আর না তো তেল লাগায় মাথায়! তুমি কাল আমার দোকানে এসো — সে তেলটা একটা কিনে নিয়ে যেও। বেশি দামও না —

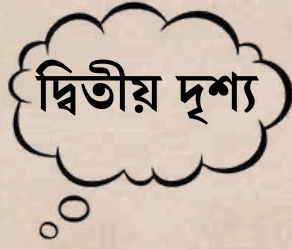
প্রসেনজিৎ – কত কত?

পঞ্চজ – এই সামান্য — মাত্র দেড়শো টাকার মতো! তুইও নিবি নাকি?
ভূপেন – দেখছো গোপালদা প্রসেনকে — কোনো দিন আশা ছাড়তে নাই!

[প্রসেনজিৎ ব্যতীত সবার হাঁসি। এমনকি গোপালও হাসে]

যতীন মাস্টার – এখন তাহলে উঠি। সন্ধ্যা হয়ে গেল।

[সবার প্রস্থান]



[বিকেলে পঞ্চজের ফাঁকা দোকানে]

[যতীন মাস্টার, জয়রাম, ভূপেন ও পঞ্চজ চা খাচ্ছে এমন সময় প্রসেনজিৎ ও গোপালের প্রবেশ]

যতীন মাস্টার – চা-টা বেশি মিষ্টি করে দিয়েছে।

জয়রাম – না, ঠিকই আছে তো —

পঞ্চজ – আরে গোপালদা যে — থামো, চা আনতে বলি —

গোপাল – না না, থাক। আমার তাড়া আছে। ওই, তোর বলা তেলটা আনতে এসেছি শুধু।

প্রসেনজিৎ – (ইতস্তত করে) আমাকেও একটা...

পঞ্চজ – আনছি।

[তেল আনতে পঞ্চজের প্রস্থান]

যতীন মাস্টার – এসব করা কি ঠিক হবে? হিতে বিপরীত না হয়ে যায়।

ভূপেন – আরে সব ঠিক হবে। গোপালদা, যা করতে বলেছিলাম কালকে করেছিলা?

গোপাল – আরে তোকে কী বলবো? কাঁচা হলুদ কাটার সাথে সরষার তেল লাগিয়ে রেখেছিলাম দেড় ঘণ্টার মতন, তো কী জ্বলন যে সহ্য করলাম, কী বলবো! আর দুপুরের দিকে পিঁয়াজের রস লাগিয়ে তো থাকতে পারি না ঘরে, এও পিঁয়াজের গন্ধ। তোর বৌদি তো ঘর থেকেই বের করে দিল তখন। চুলের জন্য এত কষ্ট সহ্য করছি, যদি কাজ না হয় তাহলে তুই বুঝবি —

ভূপেন – আরে সব হবে সব হবে।

[পঙ্কজের তেল নিয়ে প্রবেশ]

জয়রাম – আর রূপটা আসল কথা নয় হে। আসল হল মন। মন থাকলেই সব।

পঙ্কজ – বাপরে! ঠিকই নাকি! (তারপর চোয়াল শক্ত করে) তোর ওই দর্শনগুলো না, তোর কাছেই রাখ।

জয়রাম – তুই না মানলে হবে কী? তুই না মানলে তো আর সত্যিটা পাল্টে যাবে না —

পঙ্কজ – তাহলে তোর কথামতো তো তবে কোনো সমস্যায় নাই —

জয়রাম – না! শুধু মনের সমস্যা —

পঙ্কজ – টাকের তবে কোনো ক্ষতি নাই?

জয়রাম – (চিন্তা করে) সেইটা বলা...

ভূপেন – ক্ষতি নাই মানে? দ্যাখো না হে, চুলের জন্যই তো এখনো বিয়ে হল না প্রসেনের। মেয়েই পাই না!

প্রসেনজিৎ – (আমতা আমতা করে) না- ও... ওটা ব্যাপার নয়। আসলে কী — বিয়ে করতে মেয়ের আবার অভাব আছে নাকি? পছন্দই তো হয় না — তাই করিনি এখনো —

ভূপেন – কার পছন্দ হে? তুই মেয়েকে পছন্দ করিস না? না মেয়েলোকে তোকে পছন্দ করেনা ? কোনটা ?

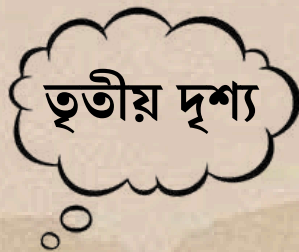
প্রসেনজিৎ – চল্ চল্। আর ফালতু বকিস না।

জয়রাম – আর আমি বলছি কী — টাক যদিও হয়ে যায়, তাতে লজ্জা আবার কী? লুকাবার কী আছে?

ভূপেন – হা, লুকাবার কী আছে — দ্যাখো তো আমাদের যতীন কাকাকে — মাথায় একটাও চুল নাই। তাই বলে কী মাথা ঢেকে রাখে? টাক লুকায়? এমনকি সরষার তেল লাগায় আর রোদে টাক চকচক করে। লজ্জা করে নাকি আবার কাকা?

গাল দ্যাখো — গালগুলো ঢুকে গেছে। দাঁতও তো নাই। তিন-চারটা আছে বোধহয়। তাও নকল দাঁত তো লাগায়নি, ওই-ই দিয়ে কাজ চালায়। সেই বলে কি লজ্জা আছে কাকার?

[যতীন মাস্টারের হন হন করে প্রস্থান]



[বিকেলবেলা পঙ্কজের দোকানে]

[যতীন মাস্টার, পঙ্কজ ও প্রসেনজিৎ উপবিষ্ট]

[এমন সময় প্রায় দৌড়বার মতো হাটতে হাটতে ভূপেনের হাঁসি মুখে প্রবেশ]

ভূপেন – আরে কী ব্যাপার জানো?

পঙ্কজ – কী হয়েছে?

[যতীন মাস্টার ও পঙ্কজের ভূপেনের দিকে উৎসুক দৃষ্টি]

ভূপেন – আরে কী বলবো। গোপালদা নকল চুল লাগিয়েছে। এদিকেই আসছে। সেই জন্যই তো তাড়াতাড়ি তাদের বলতে এলাম।

পঙ্কজ – নকল চুল! তাকে কে বলল?

ভূপেন – আরে আমি দেখলাম গোপালদাকে ওর বাড়ির কাছে — দ্যাখ না এদিকে আসবে এবার—

পঙ্কজ – ওই এল এল।

[গোপালের গম্ভীর মুখ নিয়ে প্রবেশ]

ভূপেন – কী ব্যাপার গোপালদা, আজ একদম তোমাকে আলাদা আলাদা লাগছে যে— একদম চাঙ্গা লাগছে।

পঙ্কজ – এ কয়দিনেই দেখছি চুলের এত বাহার! বাহঃ!

ভূপেন – কি প্রসেন মনে আছে? ইস্কুলে পড়তাম তখন একটা মাস্টার ছিল লালচাঁদ ঘোষ নাম করে। মাথার টাকে নকল চুল লাগাত আর একদিন হাওয়াতে উড়ে গেছিল সব — আর তখন মাস্টারের যা রাগ।

প্রসেনজিৎ – (জেনেও অজানার ভান করে) না আমার মনে নাই —

পঙ্কজ – আরে শুন। তখন বোধহয় ফাইভ-সিক্রে পড়তাম। আমরা তো রাস্তায় স্যারকে দেখলে লুকিয়ে বেরাতাম কিন্তু ওই আমার ক্লাসে একটা ছেলে পড়ত — ওই কী যে নাম — ইঁ্যা দেবু বলতাম ওকে। তো একদিন ওই ফের রাস্তায় ওই লালচাঁদ স্যারকে দেখে স্যারকে বলেছিল ‘আদাব সার’—

ভূপেন – কী —

পঙ্কজ – হা “আদাব সার” বলেছিল রাস্তায়। দিয়ে পরে ইস্কুলে ওকে যা মার মেরেছিল স্যার, এখনো মনে আছে। কী ব্যাপার গোপালদা চুপচাপ কেন?

[গোপাল পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে — এমন সময় ভূপেন গোপালের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত দিতেই গোপালের একটা জোরদার চড় ভূপেনের গালে! তারপর ভূপেনের অবাক দৃষ্টিতে শুধু এরওর মুখের দিকে চাওয়া। সকলে অবাক।]

গোপাল – তোর জন্যই সব হল।

[তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ দাড়িয়ে নিজে থেকেই গোপাল মাথার নকল চুল খুলে ফেলল।]

প্রসেনজিৎ – আরে বাপরে এটা কী হল? এটা যে আমার থেকেও কম! আরে — মানে হল কেমন করে? হঠাৎ —
গোপাল – (রেগে) আরে এই ভূপনার জন্যে আর পঙ্কজের জন্যেই তো হল সব। (তারপর মুখ বিকৃত করে বলল)
হলুদ লাগাবা — পিঁয়াজের রস লাগাবা। (তারপর পঙ্কজের দিকে চেয়ে বলল) আর তোর তেলটা কী রে? তেলটার কাজ কী? চুল গজানো, না চুল উড়াবার কাজ?

[পঙ্কজ এক পা পিছিয়ে দাড়াল]

না, মাথাটা আমার বেকার করে দিল একেবারে।

যতীন মাস্টার – আমার কথা তো শুনবা না, না? বয়সের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলা — বয়সকে হার মানাবা, না!

[যতীন মাস্টারের হন হন করে প্রশ্বাস]

[সমাপ্তি]



*D
r
a
w
i
n
g*

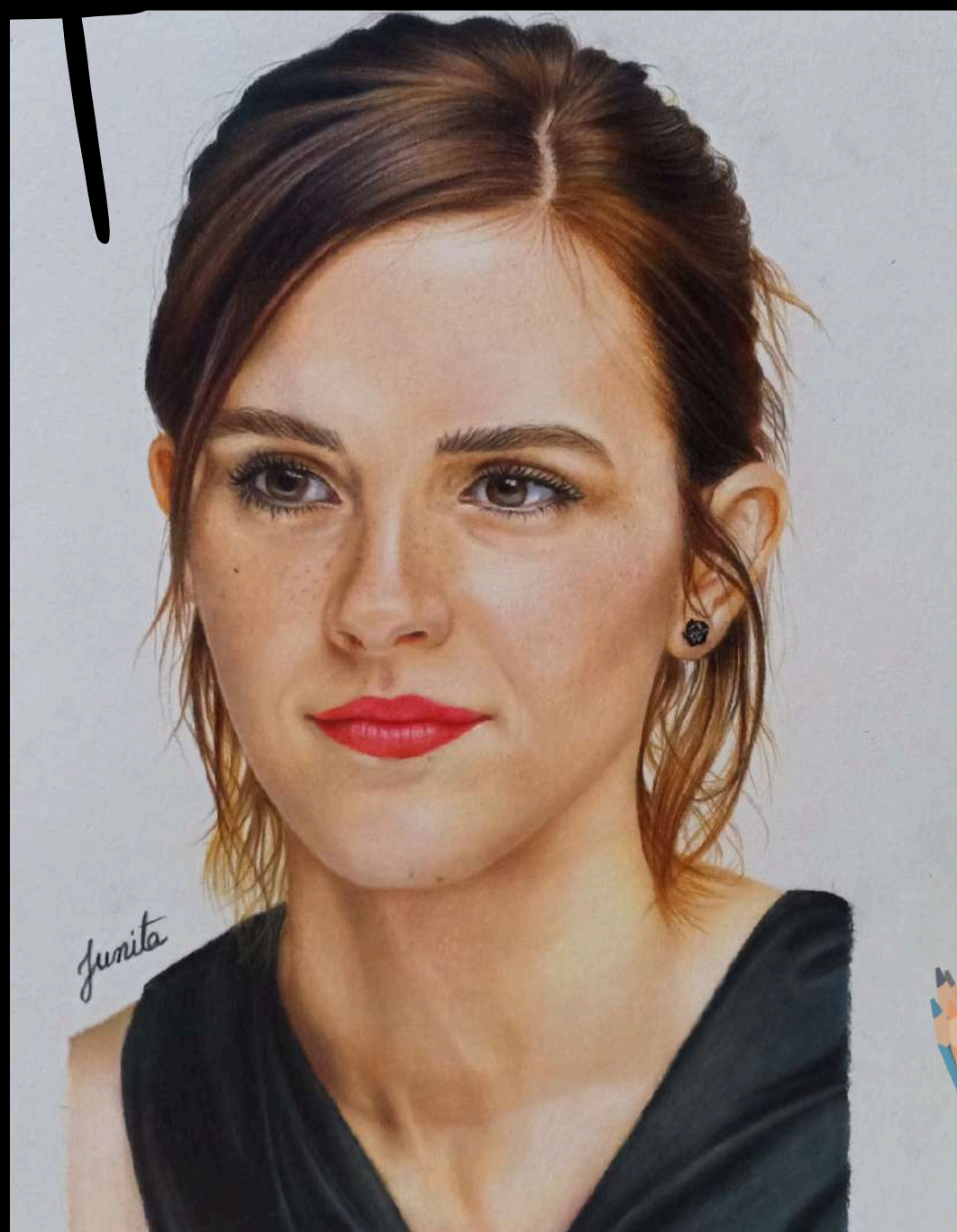


Crafts



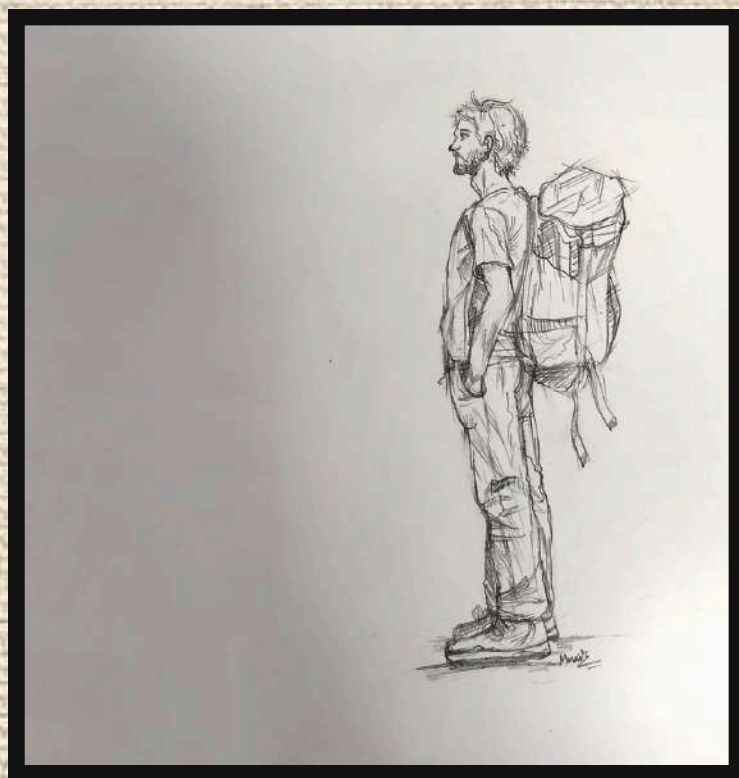
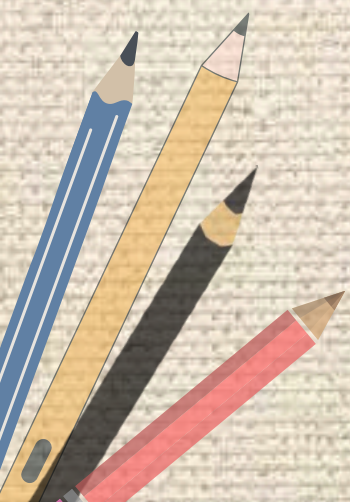
Junita Jaiswal

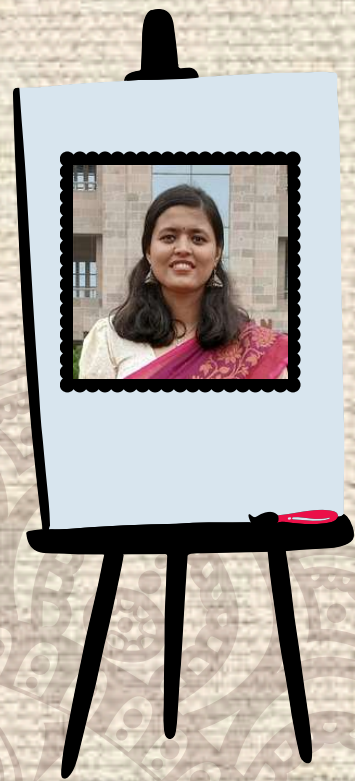
(1st year, 2024-26)





Meghna Maity
(2nd year, 2023-25)



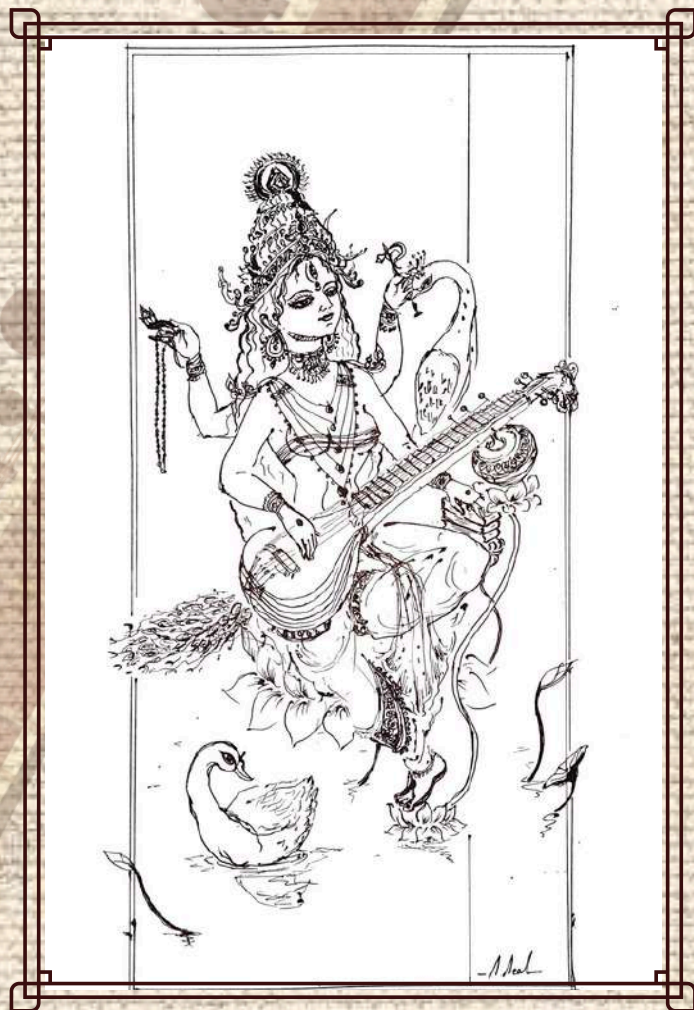


Sneha Bhunia

(2nd year, 2023-25)

Srijit Seal

(1st year, 2024-26)

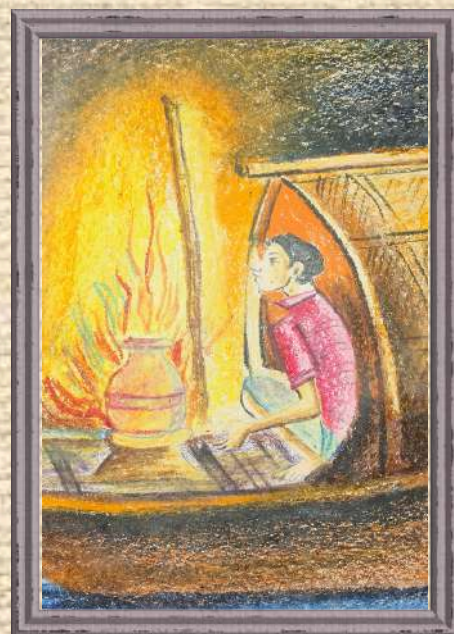






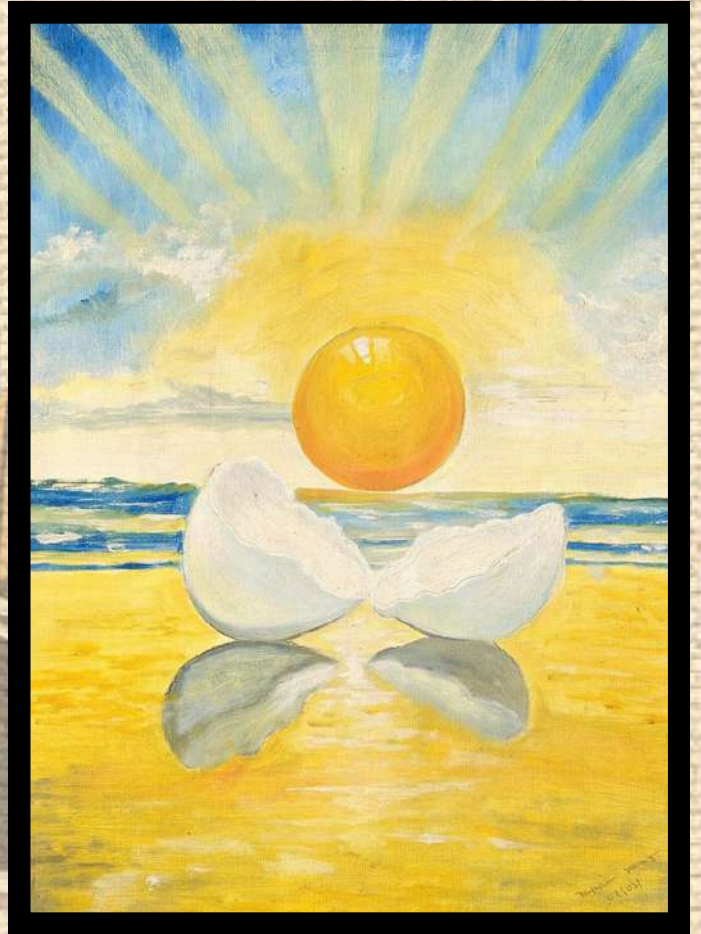
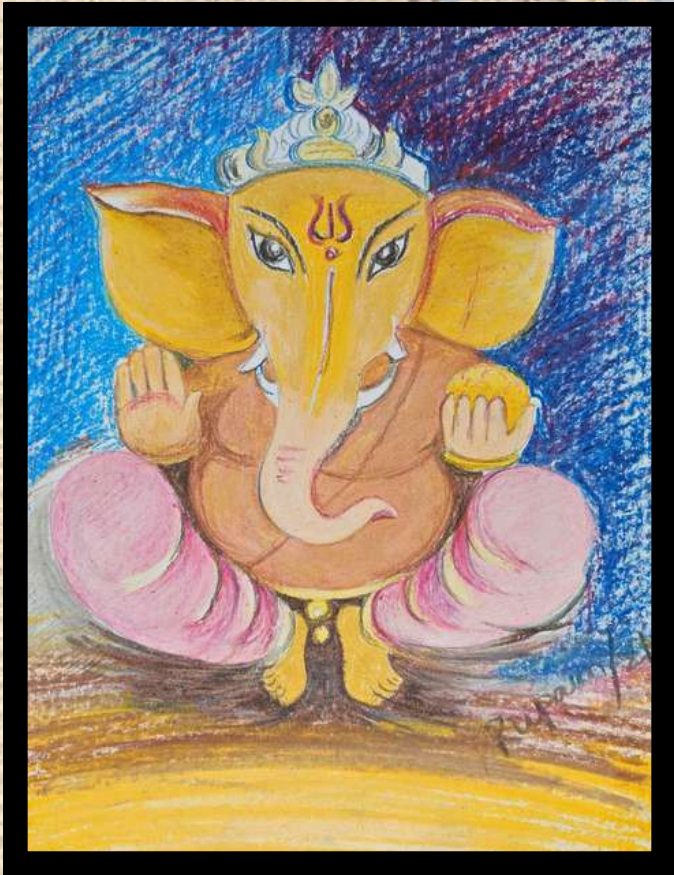
Sudip Sarkar

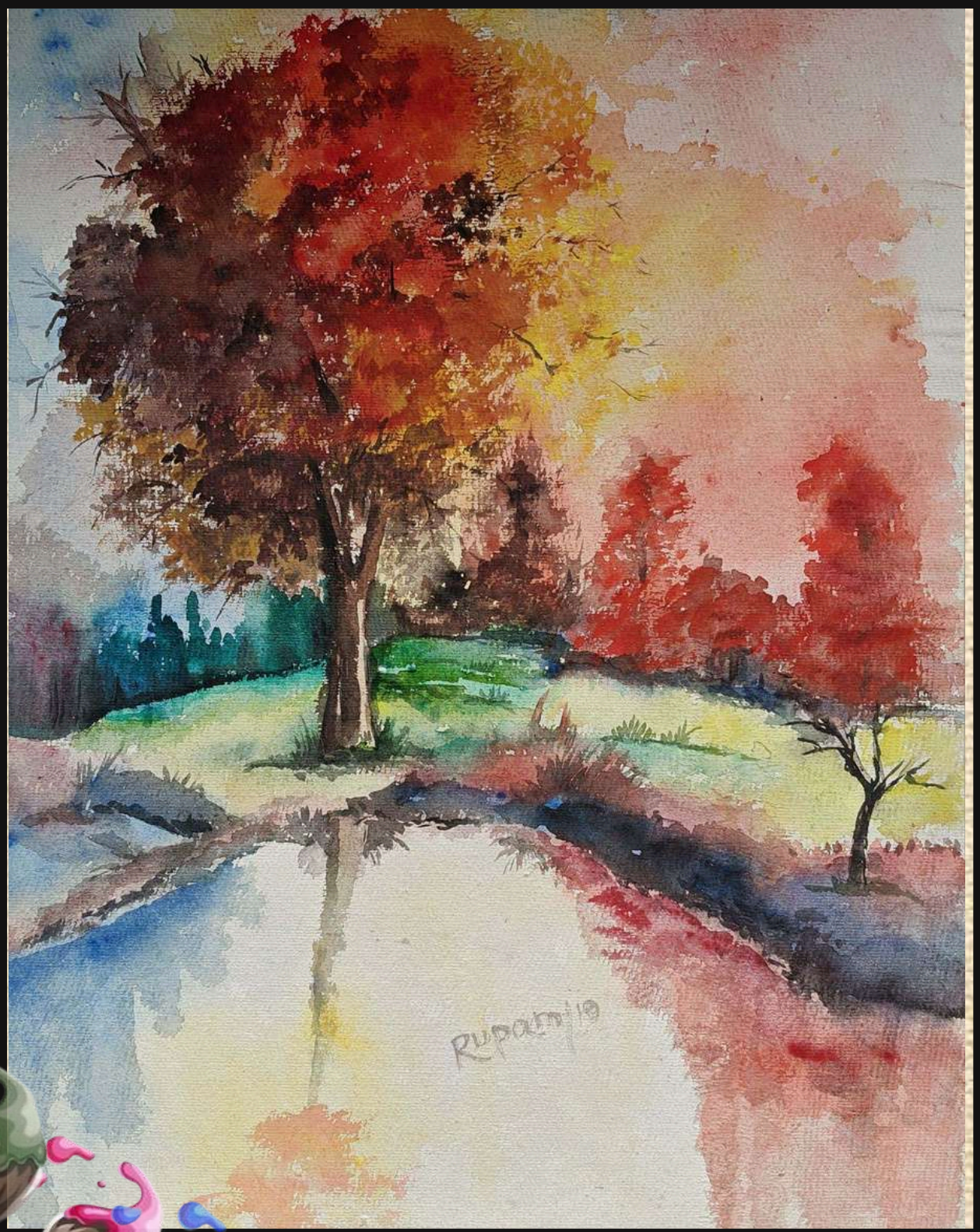
(1st year, 2024-26)

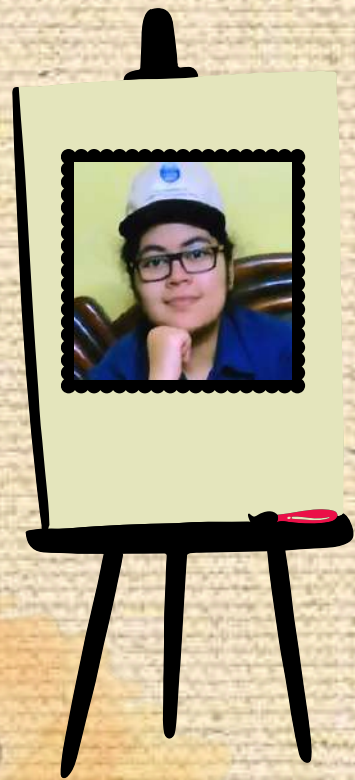


Rupam Nandy

(1st year, 2024-26)





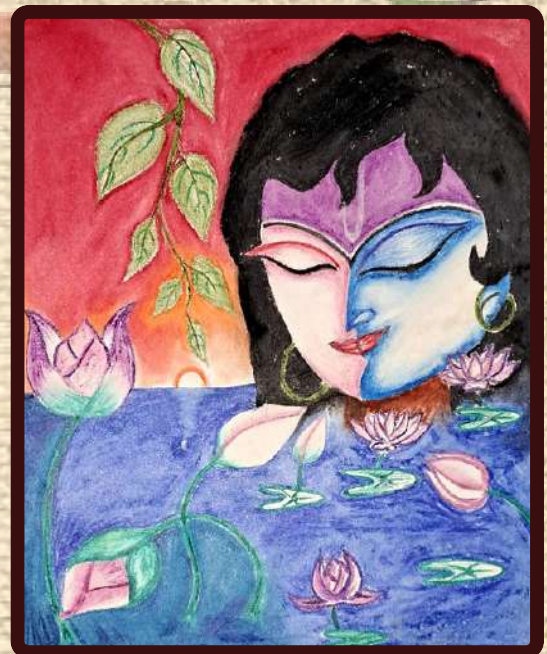
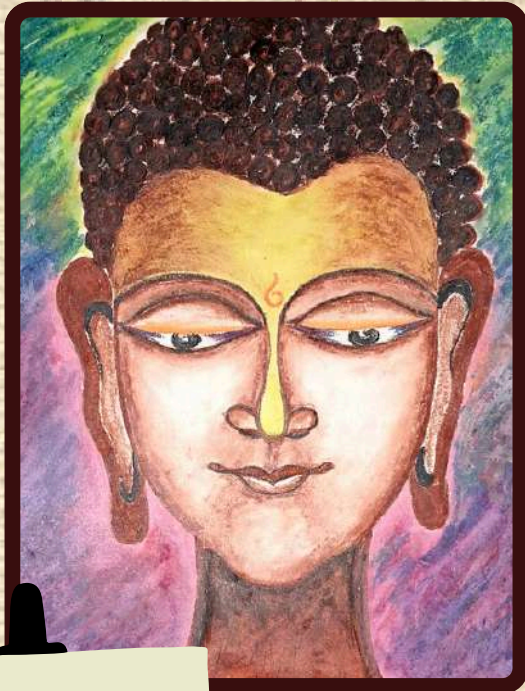


Sohini Mitra
(2nd year, 2023-25)



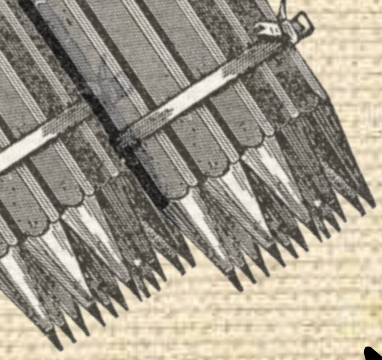
Deboleena Podder

(1st year, 2024-26)



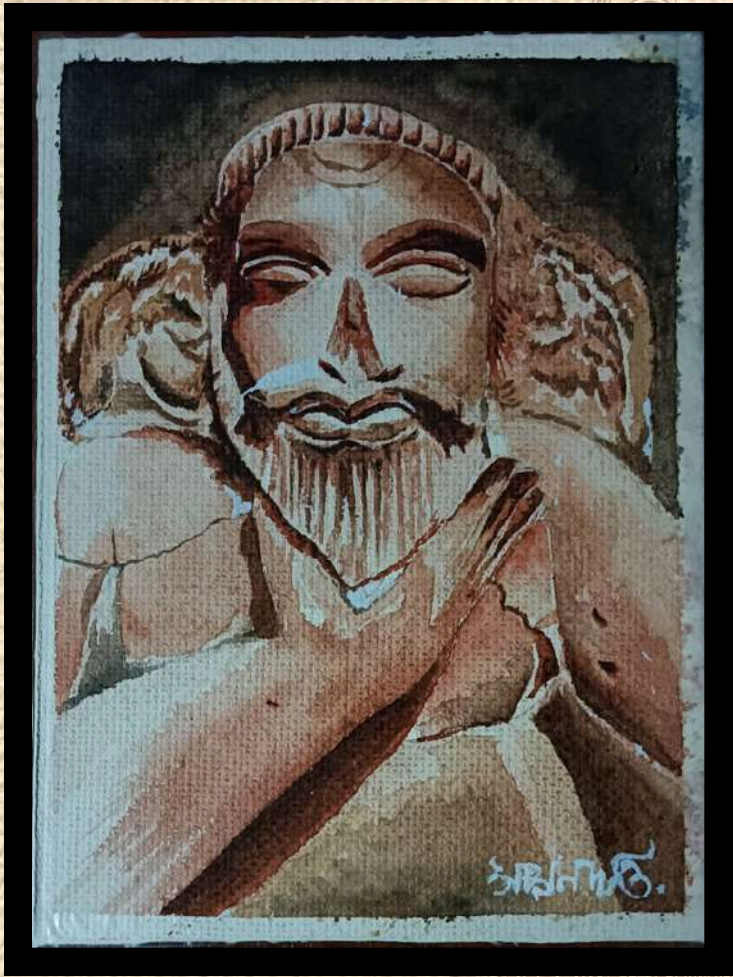


Supriya Pal
(2nd year, 2023-25)



Sayan Dutta
(2nd year, 2023-25)



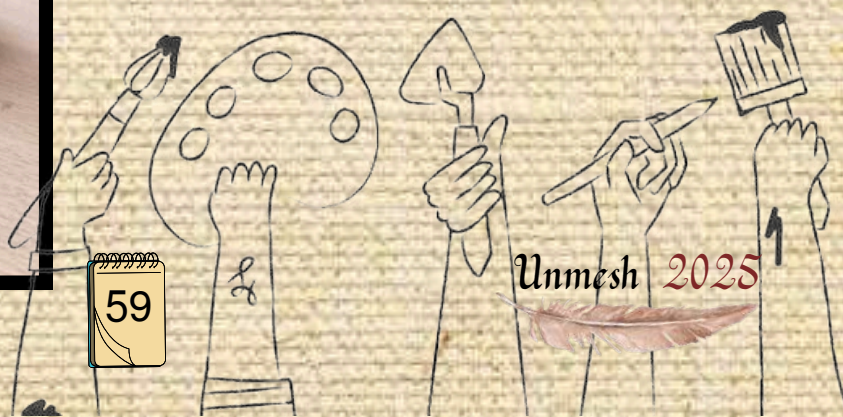
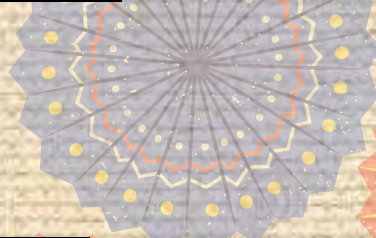
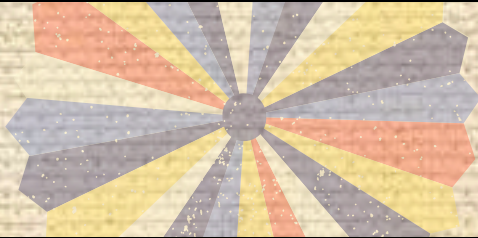






Supriya Pal

(2nd year, 2023-25)





Aritra Basak
(2nd year, 2023-25)





Srijit Seal

(1st year, 2024-26)



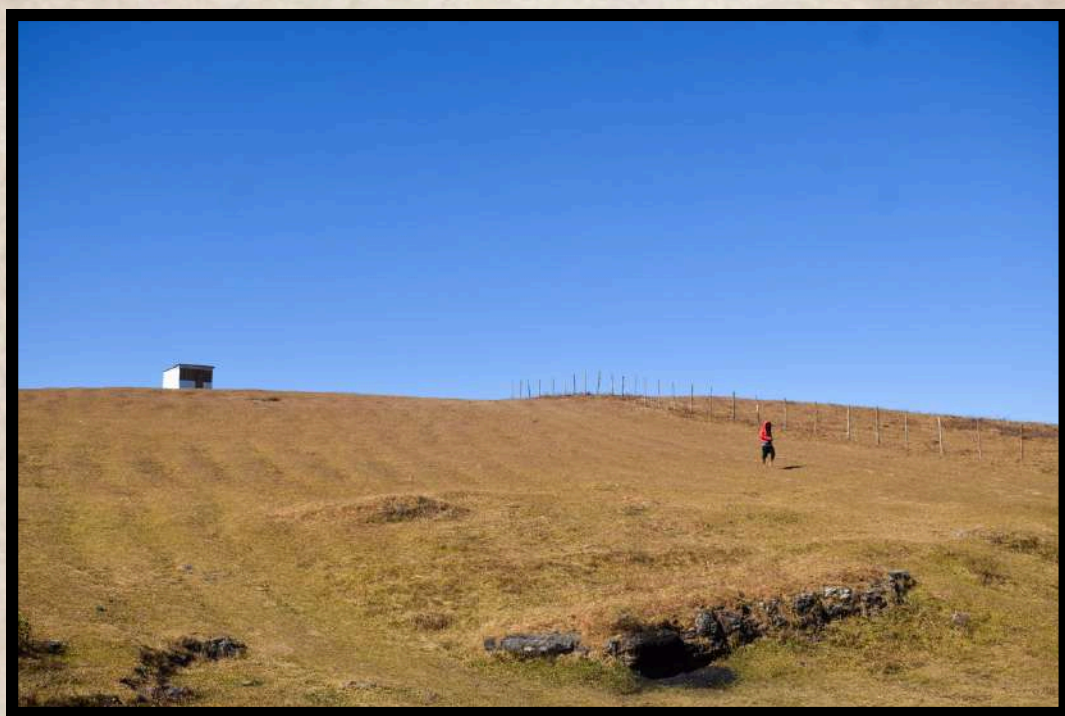


Photography

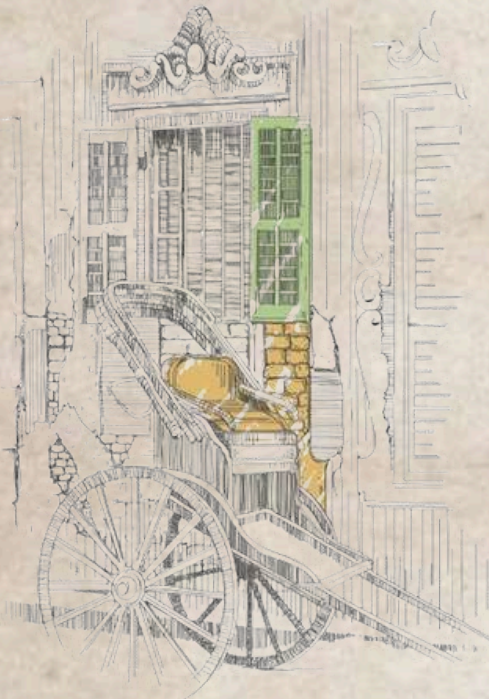


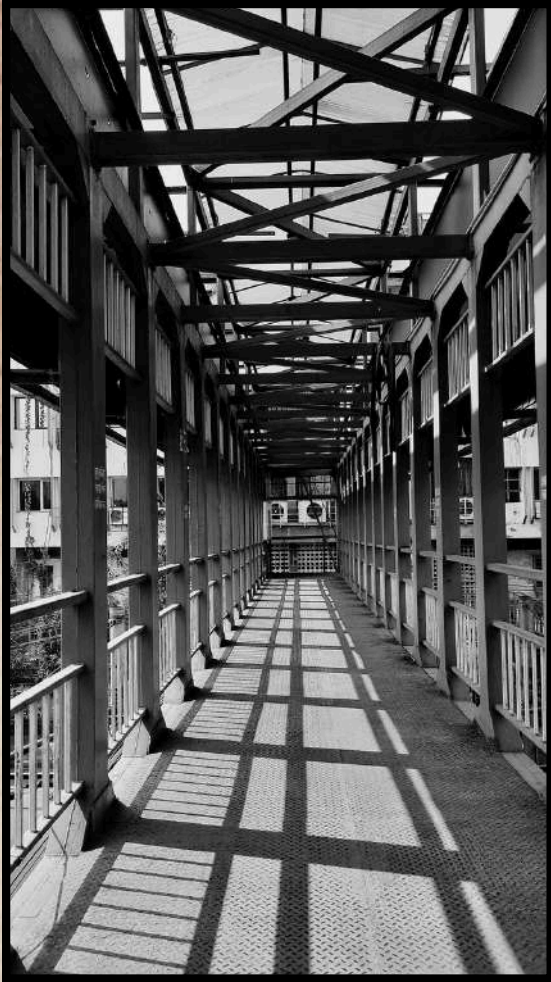
Arka Bhattacharyya

(Phd. Scholar)



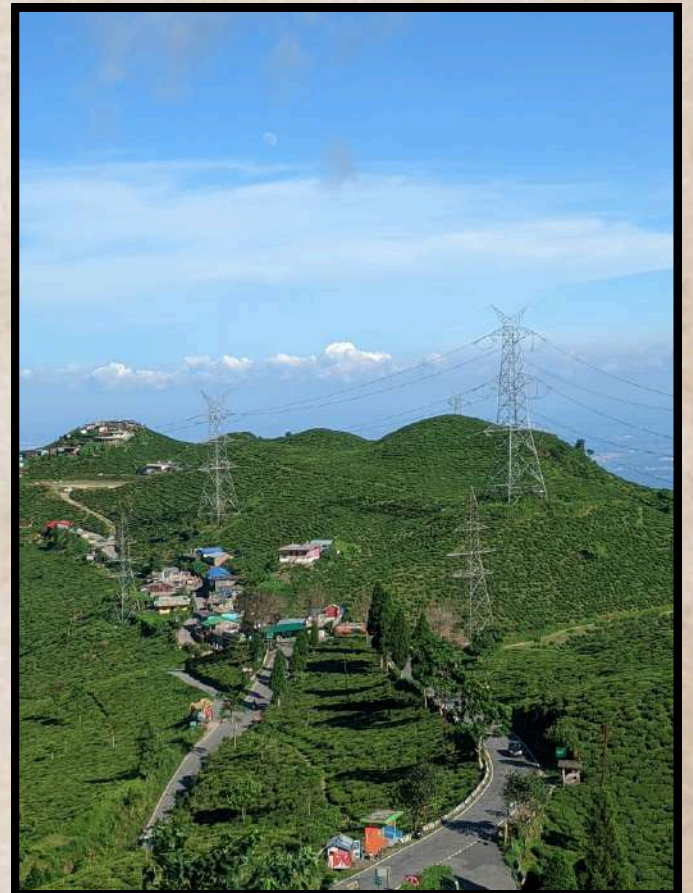


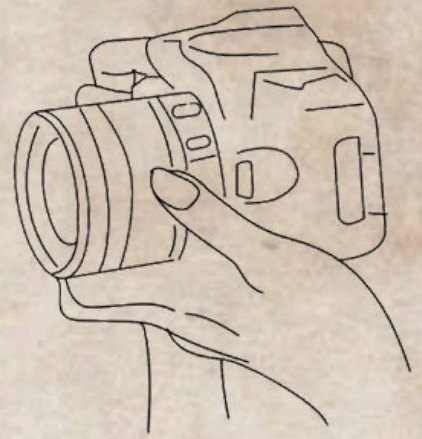




Akash Sharma

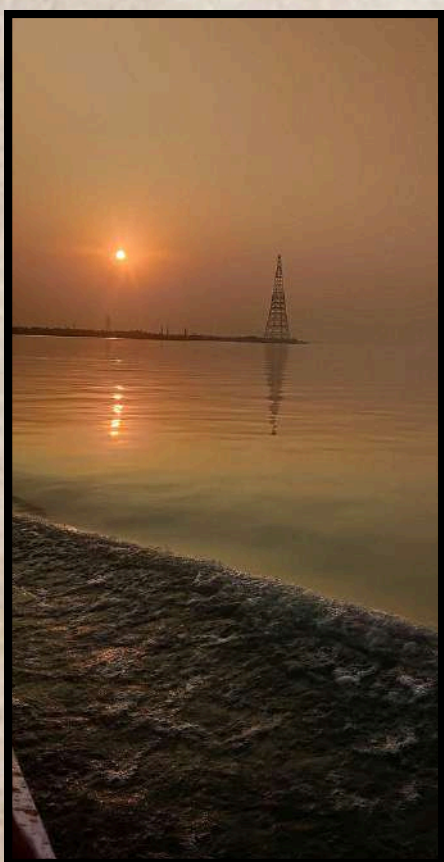
(1st year, 2024-26)

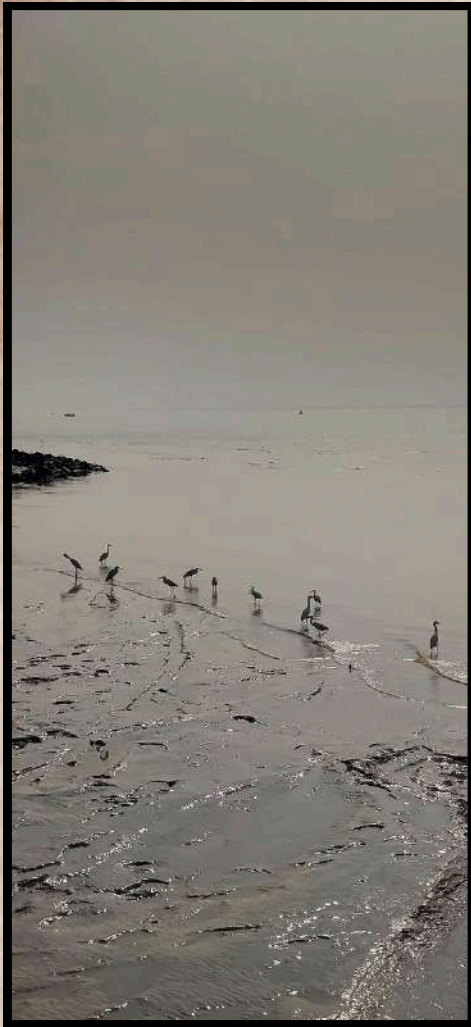






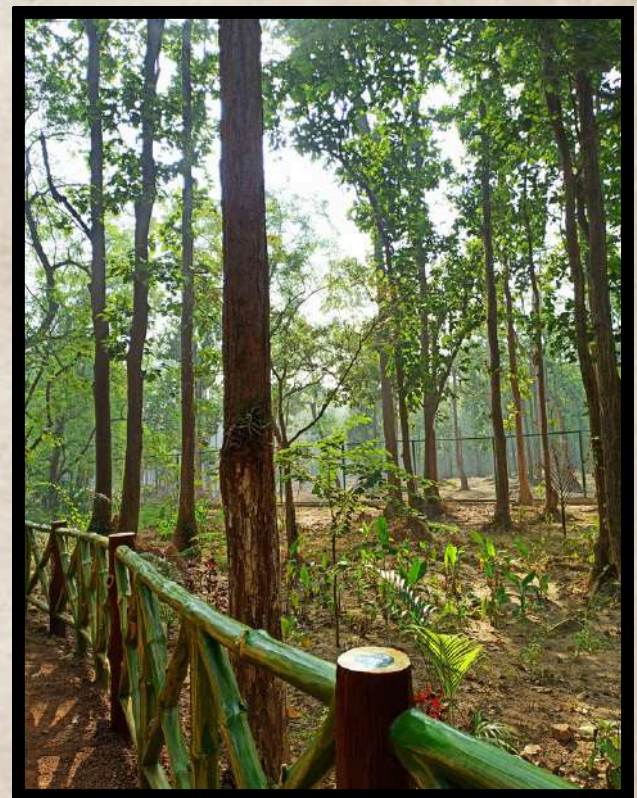
Aritra Basak
(2nd year, 2023-25)







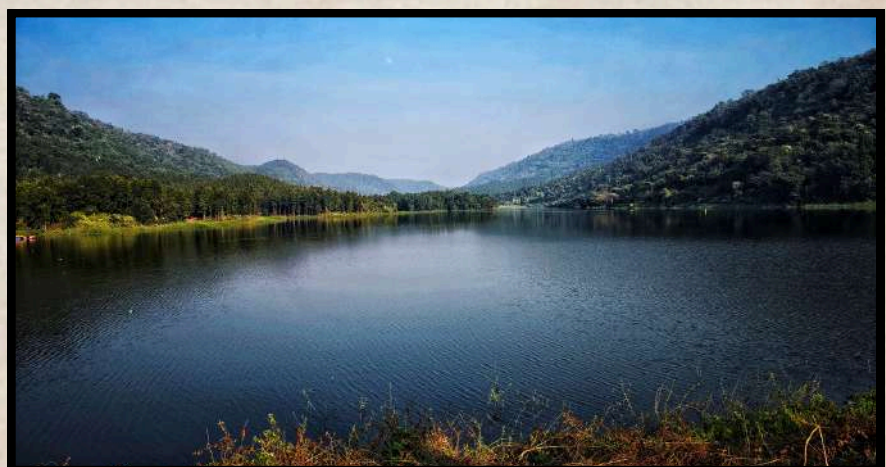
Atasi Bhattacharyya
(2nd year, 2023-25)

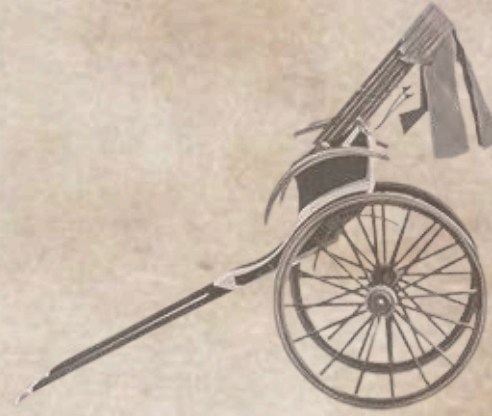


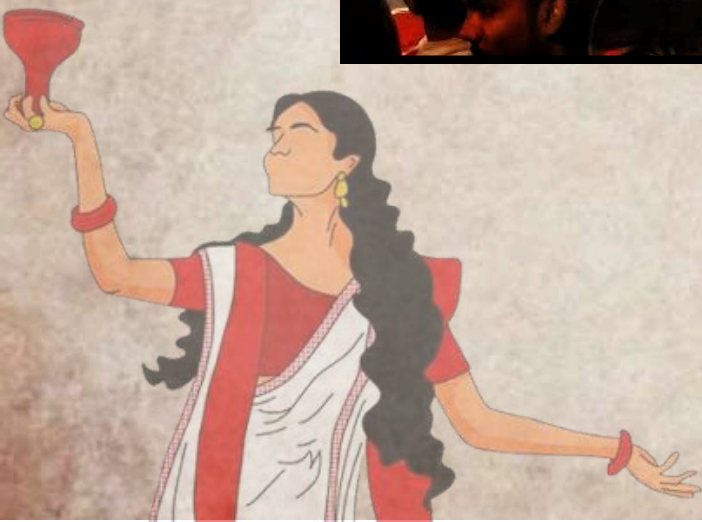
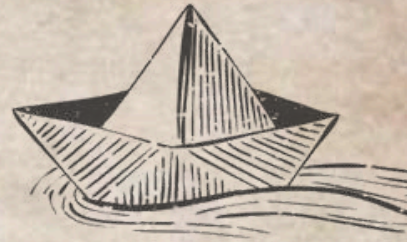
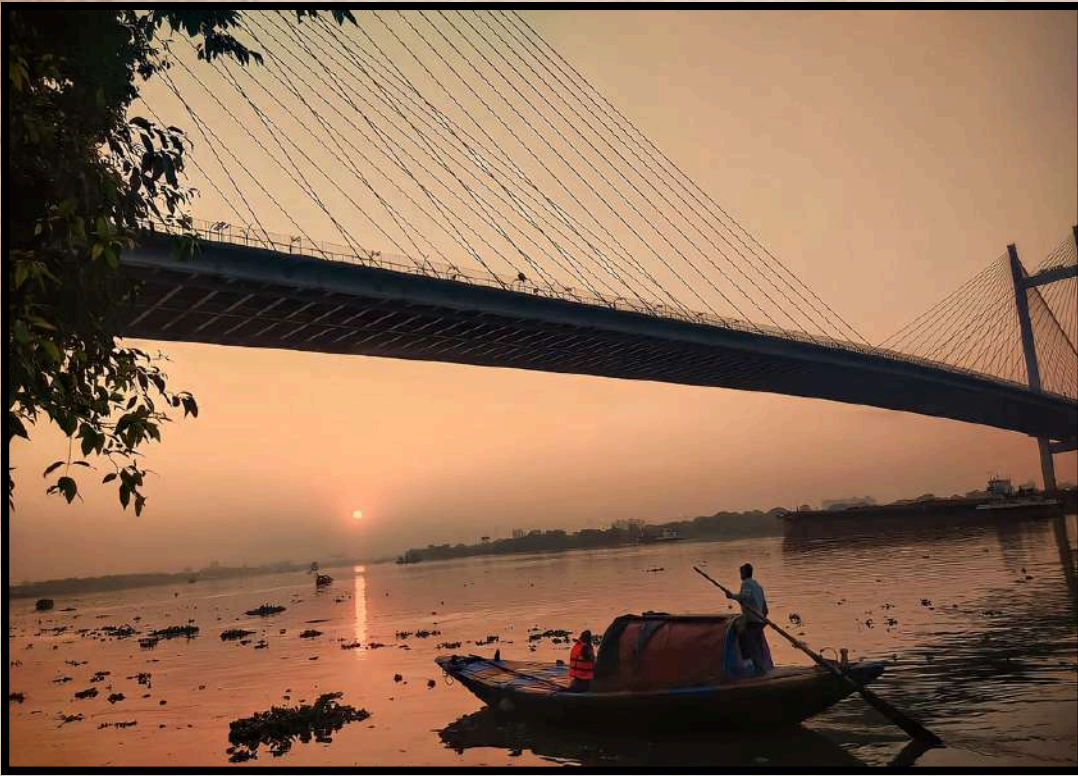




Meghna Maity
(2nd year, 2023-25)







Ritwik Das

(2nd year, 2023-25)

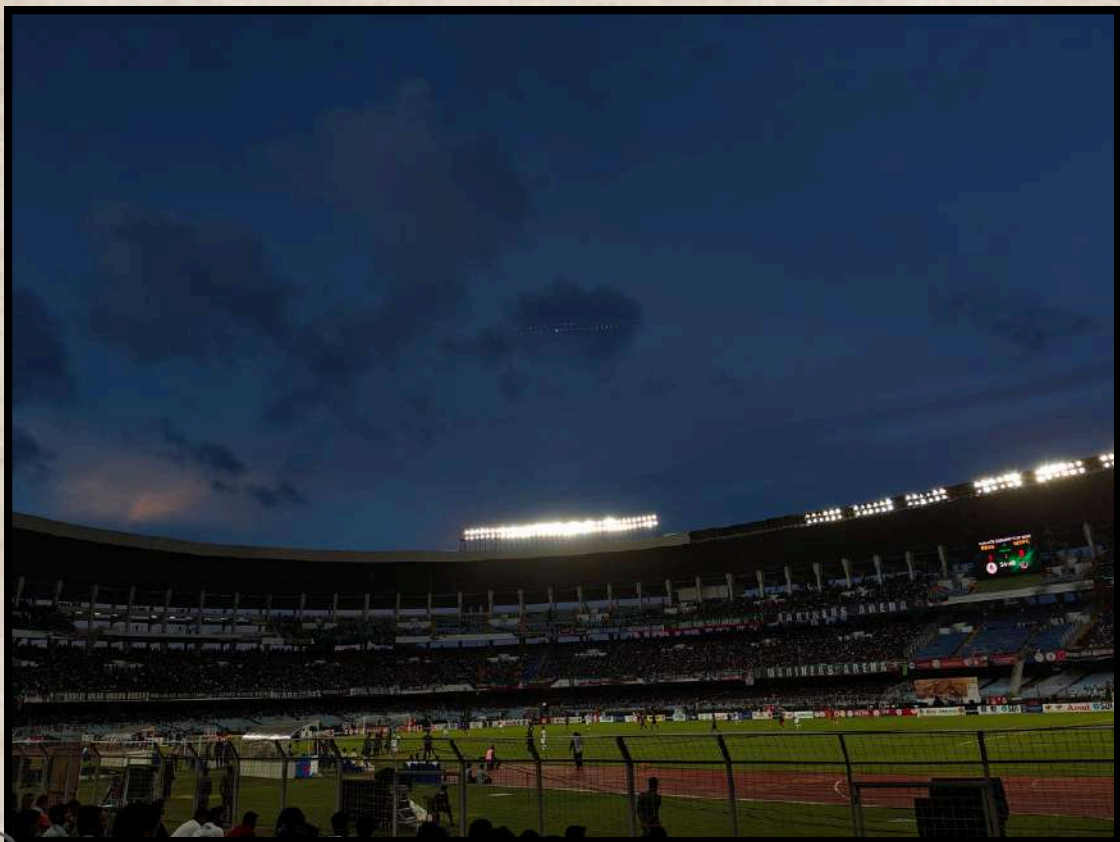
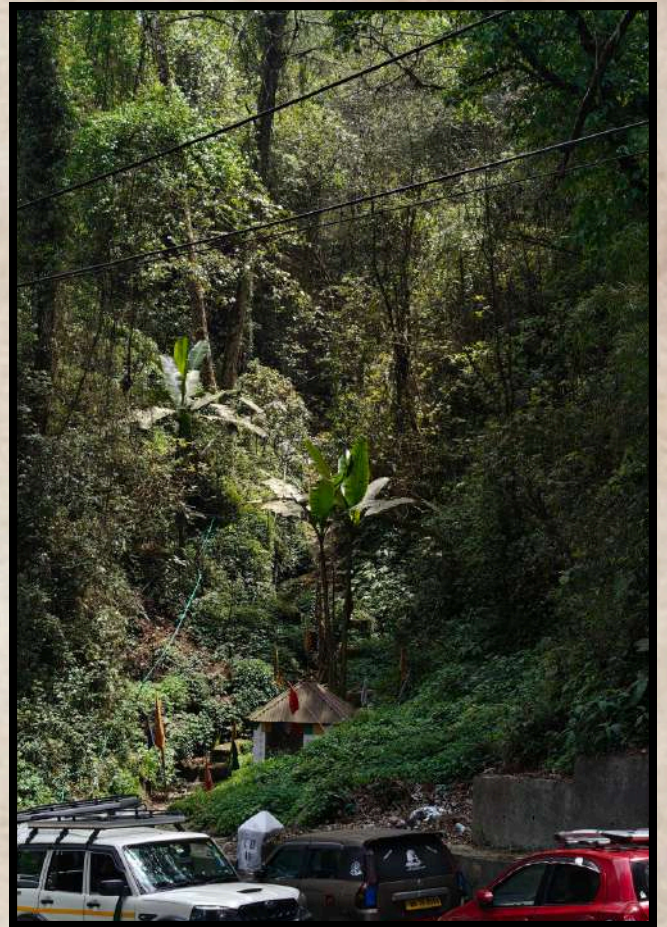
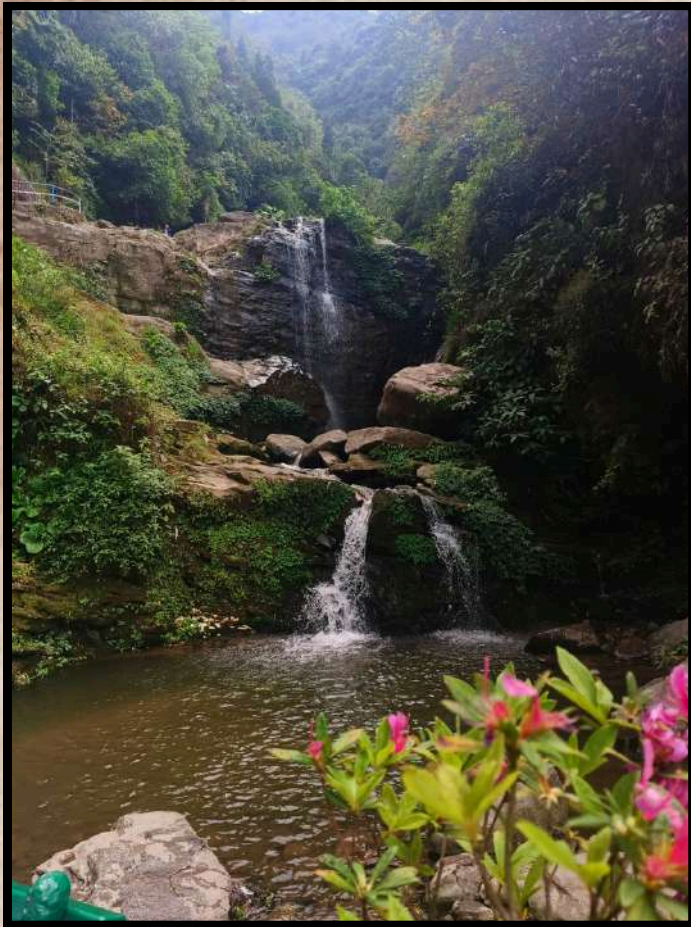


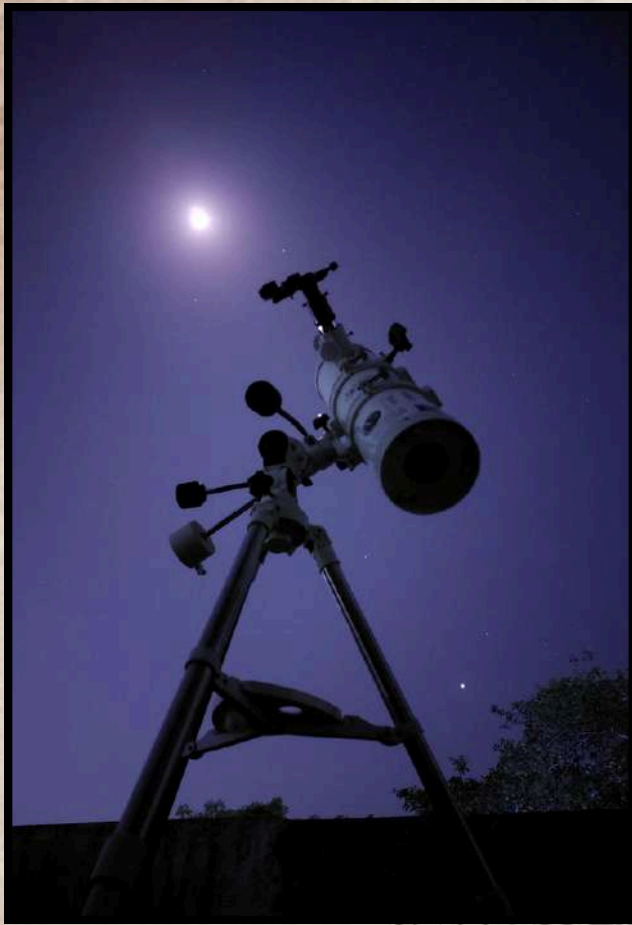




Rupam Nandy
(1st year, 2024-26)







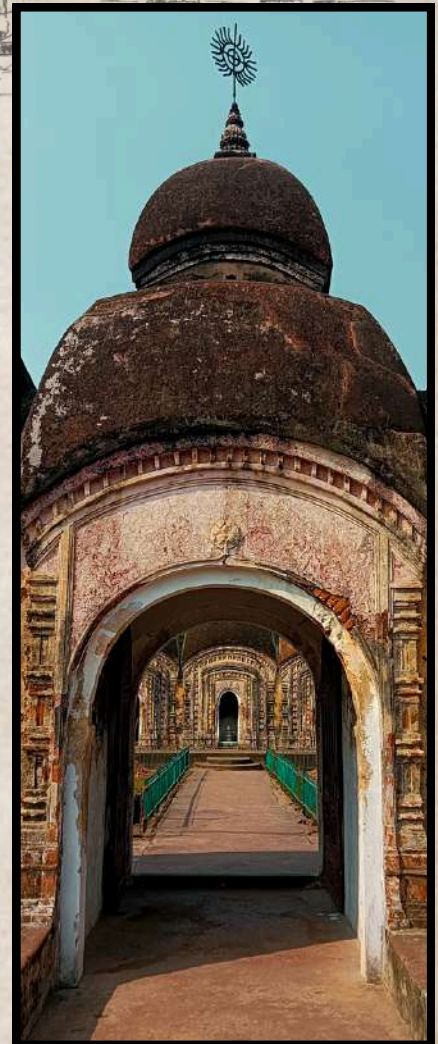
Saptarshi Bhaduri
(1st year, 2024-26)

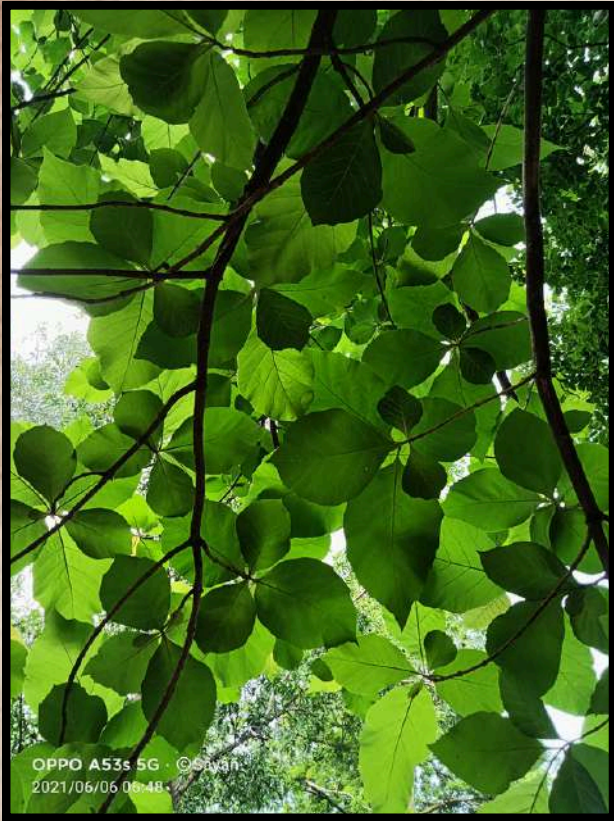






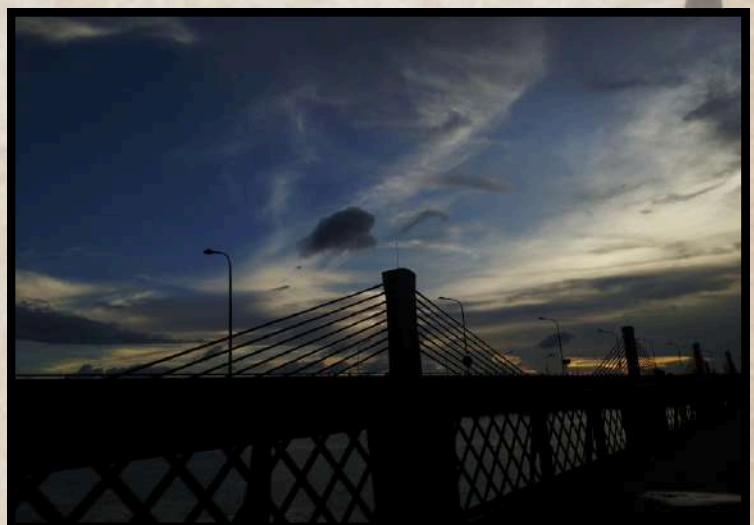
Sayan Dutta
(2nd year, 2023-25)





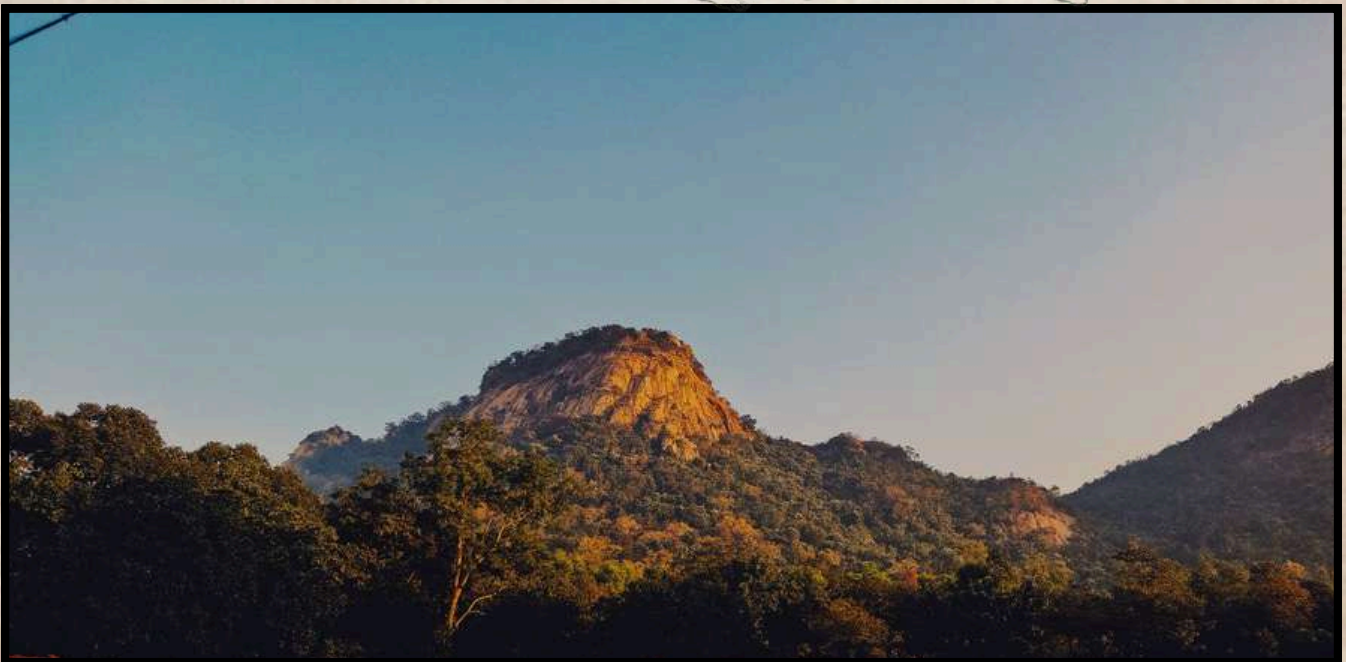


Sneha Bhunia
(2nd year, 2023-25)





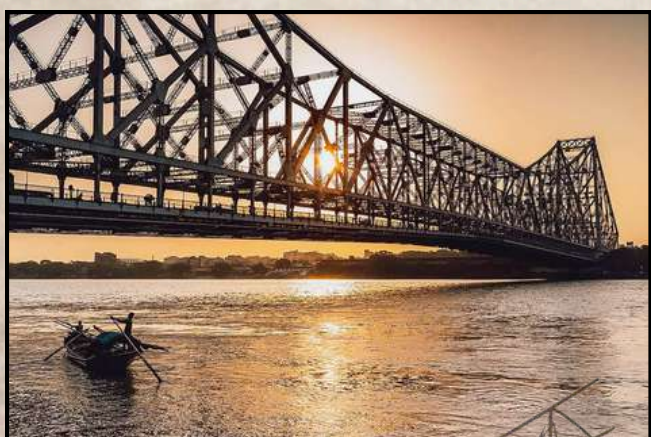
Somnath Roy
(2nd year, 2023-25)







Soumodip Dey
(2nd year, 2023-25)

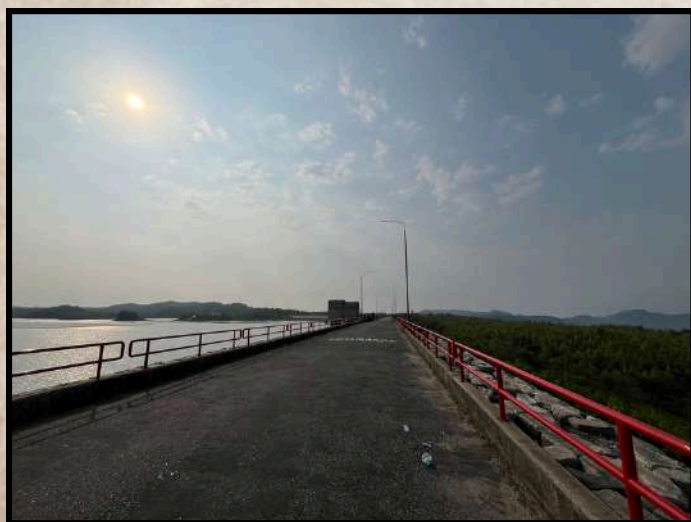






Soumyadip Sarkar

(2nd year, 2023-25)



Unmesh 2025



Sudip Sarkar

(1st year, 2024-26)

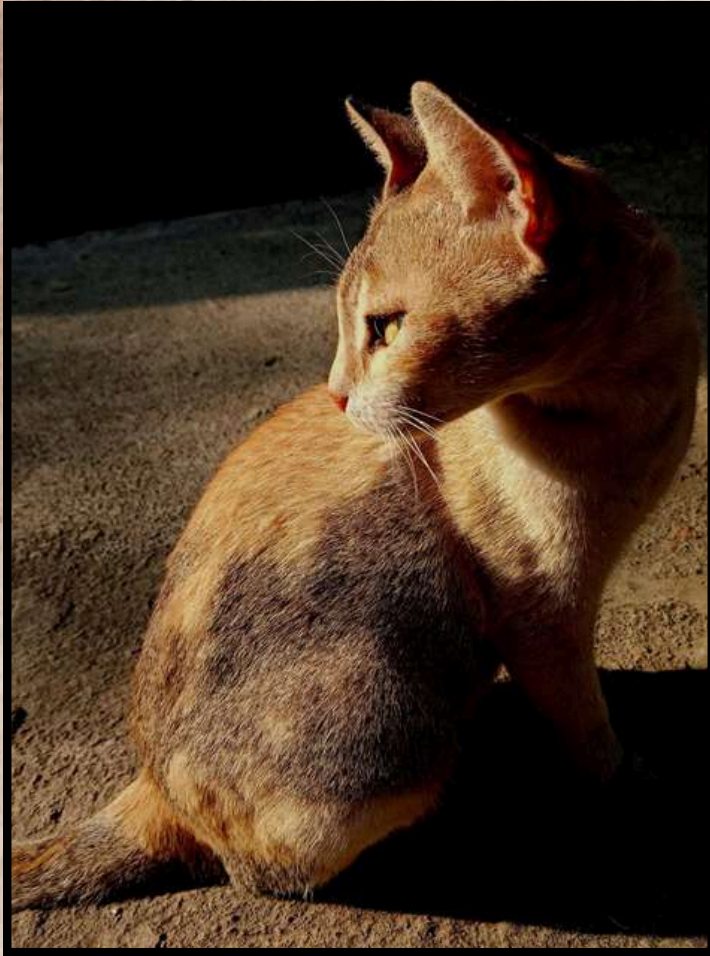


Unmesh 2025



Supriya Pal
(2nd year, 2023-25)





Sushmita Biswas
(2nd year, 2023-25)





Mariom Mamtaj
(Batch, 2021-23)

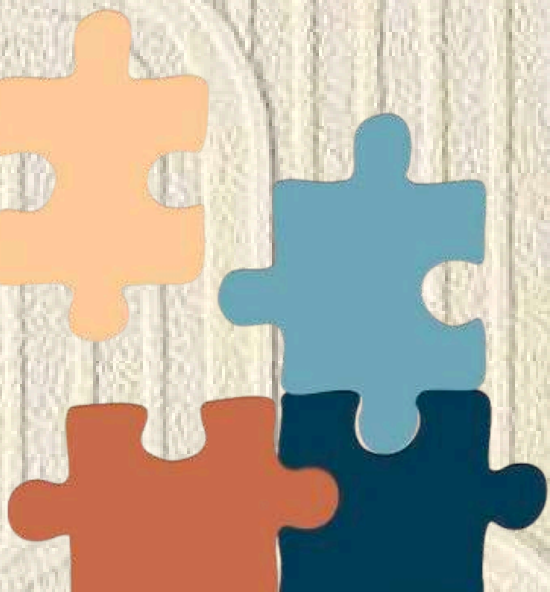


T H E

E V E N T

H O R I Z O N

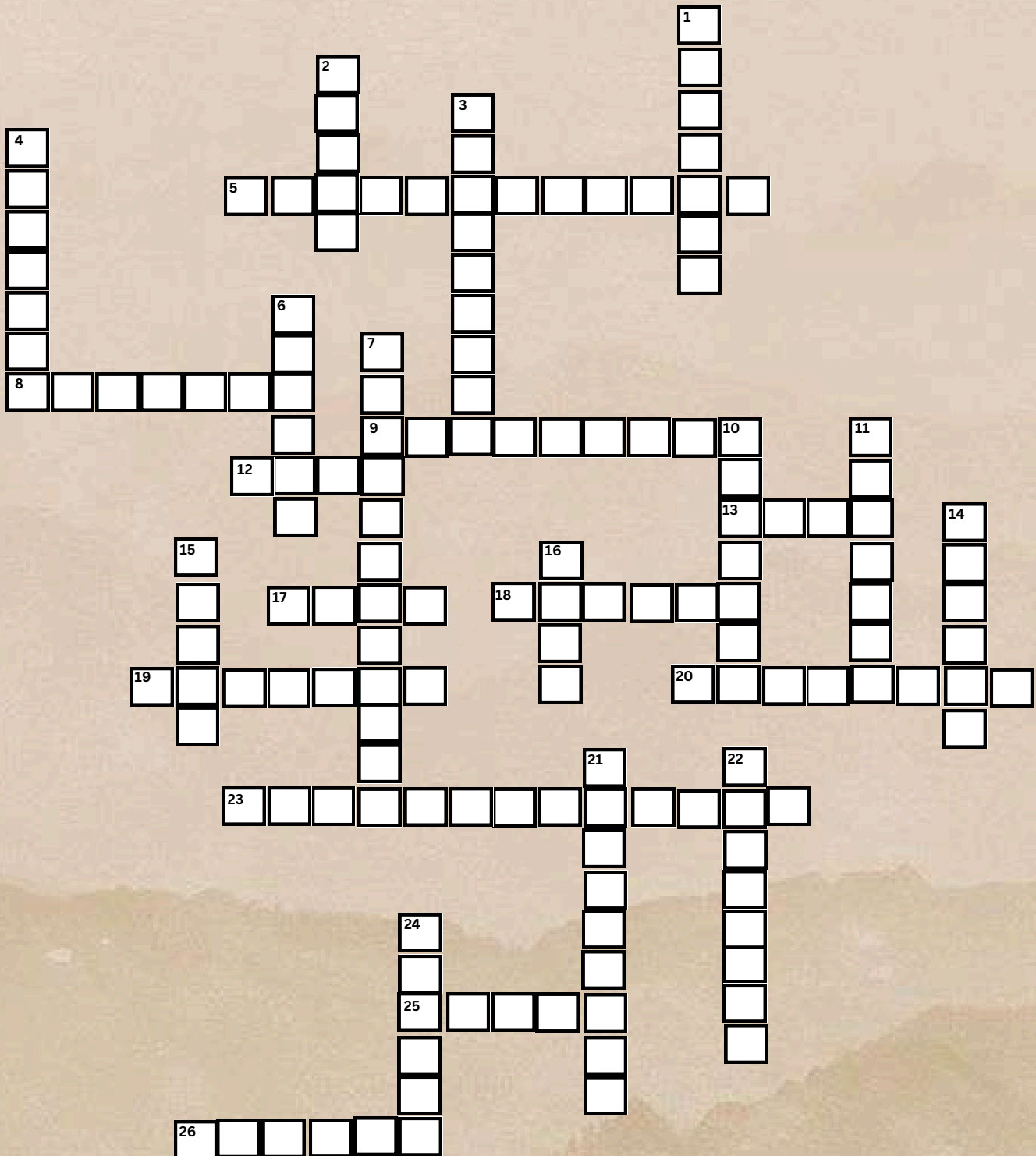
Alert: Once you cross it, you're
sucked into puzzles!



CrossWord

INSTRUCTIONS

Complete the crossword puzzle by filling in words that match the given clues. Use logic, word patterns, and intersecting letters to solve each clue. Enjoy the challenge!



Across

5. A measure of how a material responds to and allows magnetic fields.
8. A numerical integration rule named after an 18th-century mathematician.
9. A transformation that preserves angles but not necessarily lengths.
12. A point in a wave or standing pattern where the amplitude is zero.
13. A meson involved in mediating the strong nuclear force.
17. Physicist who contributed to quantum mechanics and the probabilistic interpretation.
18. A vast cloud of gas and dust in space; often a stellar nursery.
19. A set of transformation equations fundamental to special relativity.
20. A neutral, nearly massless particle that interacts only via the weak force.
23. Astrophysicist known for the mass limit of white dwarfs.
25. A tensor used in general relativity to describe curvature of spacetime.
26. A fundamental particle not affected by the strong nuclear force (e.g., electron).

Down

1. A self-similar geometric structure with non-integer dimension.
2. An elementary particle and fundamental constituent of matter.
3. Mathematician known for algebra used in vector spaces and exterior calculus.
4. The diffusion of solvent molecules through a semipermeable membrane.
6. A mathematical object used to describe physical quantities in the general theory of relativity.
7. The rate at which velocity changes with time.
10. A differential operator used in physics, named after a French mathematician.
11. A coordinate system used to describe uniformly accelerated frames.
14. A transformation preserving points, straight lines, and parallelism.
15. A force-carrying particle that obeys Bose-Einstein statistics.
16. The rate of change of acceleration; third derivative of position.
21. A process where a function or definition refers to itself.
22. A topological space that locally resembles Euclidean space.
24. A heavy subatomic particle made of three quarks (e.g., proton, neutron).



sudoku

INSTRUCTIONS

Use the numbers 1 to 9 to complete the Sudoku.
Only use each number once in each row, column and grid.

	2		6		8			
5	8				9	7		
				4				
3	7					5		
6								4
		8					1	3
				2				
		9	8				3	6
			3		6		9	

**SNAPSHOTS =
VIBES X TIME**

$$S = \mathfrak{V} t$$

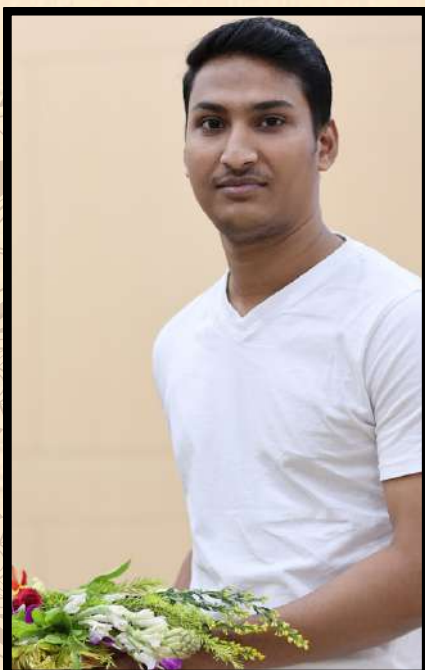
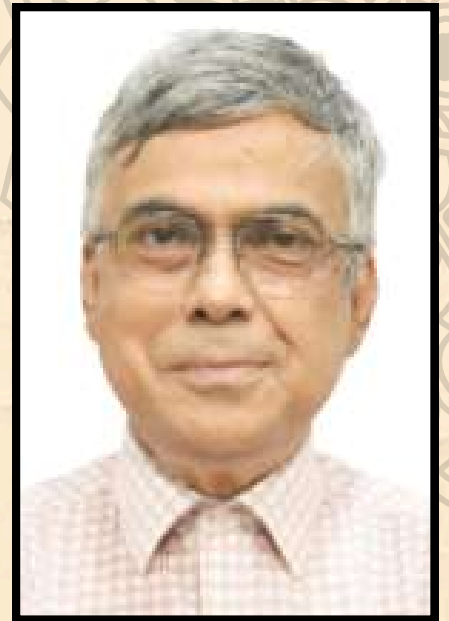
**CLICKS THAT
CAPTURE THE
VIBE OF FLEETING
MOMENTS**





Our faculty members





Bidyarthi Brata 2023 - 24



Saraswati Puja 2025

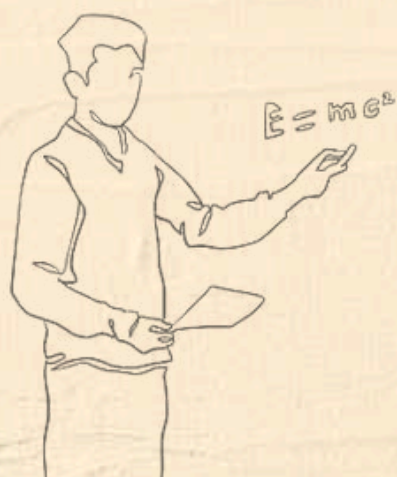


Departmental Freshers

Entangled 25



Teacher's Day Celebration



Unmesh 2025

Departmental Picnic

Physifesta 25



Unmesh 2025

Departmental Farewell

Fission 25



ANSWER OF THE CROSSWORD PUZZLE

ACROSS

5. Permeability, **8.** Simpson, **9.** Conformal, **12.** Node, **13.** Pion, **17.** Born, **18.** Nebula, **19.** Lorentz, **20.** Neutrino, **23.** Chandrasekhar, **25.** Ricci, **26.** Lepton

DOWN

1. Fractal, **2.** Quark, **3.** Grassmann, **4.** Osmosis, **6.** Tensor, **7.** Acceleration, **10.** Laplace, **11.** Rindler, **14.** Affine, **15.** Boson, **16.** Jerk, **21.** Recursion, **22.** Manifold, **24.** Baryon

ANSWER OF THE SUDOKU

1	2	3	6	7	8	9	4	5
5	8	4	2	3	9	7	6	1
9	6	7	1	4	5	3	2	8
3	7	2	4	6	1	5	8	9
6	9	1	5	8	3	2	7	4
4	5	8	7	9	2	6	1	3
8	3	6	9	2	4	1	5	7
2	1	9	8	5	7	4	3	6
7	4	5	3	1	6	8	9	2



Beyond the blackboard

As pages turn and seasons change, there are some moments that linger—soft echoes of laughter in the hallways, hurried footsteps before lectures, quiet corners that knew our thoughts before we spoke them. “Unmesh” is not just a collection of articles and photographs—it is a living memory, stitched together by the shared experiences of a department that has become a family.

*In these few final lines, we pause—not to say goodbye, but to hold space for gratitude. To our teachers, who shaped not only our minds but also our values. To our peers, who became partners in every joy and every deadline. And to this space **RKMVERI** that gave us more than knowledge: it gave us belonging.*

As we close this chapter, may these echoes follow us wherever we go, reminding us that once, in a corner of the world steeped in quiet brilliance, we belonged to something beautiful.

VRUMESH

A Manifestation of Creativity



<https://physics.rkmvu.ac.in/>



[/RKMVERIphysics](https://www.facebook.com/RKMVERIphysics)



[Dept of Physics RKMVERI](#)

